কমপিউটার চালানো শেখা ও জানা

প্রাথমিক পর্যায়

বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পাঠ সংকলন

Computer Chalano Shekha O Jana – Prathomik Porjaay

By Sutanu Bhattacharya

First Edition
February 2019

© Sutanu Bhattacharya

Published by:
Sutanu Bhattacharya
63/114B Prince Anwar Shah Road
Rhineview Flat 5B, Kolkata 700045
Contact: (+91)9433064877/(+91) 9831943859
E-mail:sutnbh@gmail.com

Printed by:
Biswajyoti Sarkar
S. R. Printers
62/A Baithakkhana Road, Kolkata 700009, India
Contact: (+91) 9830168575

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher and copyright owner.

NOT FOR SALE
This study material, developed at Phuldanga Bidyacharcha Kendra, Shyambati, Birbhum, West Bengal, is meant for free distribution for education and learning purposes. Care has been taken not to violet any existing copyright or intellectual property right. If any copyright is inadvertently infringed, please notify the publisher for corrective action.

এই বইটা কেন

আজকাল কমপিউটার ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ ধারণা থাকা প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদিও অধিকাংশ সাধারণ মানুষের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে রোজকার জীবনধারণ হয়ত এটা ছাড়াও চলেই যায়। কিন্তু, নিজের সম্বন্ধেই মনে হতে থাকে যে আমি এই দুনিয়ার কত কী জানিনা। তাই একটু-আধটু কমপিউটার চালিয়ে একটা সাধারণ ধারণা করে নেওয়া আজকাল ইস্কুলে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছে প্রাথমিক স্তরের শেষেই। জিনিষটা যেহেতু একটা যন্ত্র, তাই হাতে কলমে না চালানো পর্যন্ত, শুধু বই পড়ে এটাকে ঠিক জানা হয় না।

সাধারণ একটা কমপিউটার মোটের ওপর চালাতে পারা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। একটু আধটু দেখিয়ে দিলে, অথবা হাতের কাছে কমপিউটার পেলে শিশুরা তা আপনি শিখে ফেলে। কিন্তু এই শেখা নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। ধাপে ধাপে ঠিকভাবে শেখা প্রয়োজন। কমপিউটার চালানো মোটের ওপর দেখিয়ে দেওয়ার কাউকে পাওয়া মুশকিল, বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। আর পাওয়া গেলেও, ঠিক মতো যে শেখাবেন তা নাও হতে পারে। সস্তায় বা বিনামূল্যে দু-একটা কমপিউটারের ব্যবস্থা হয়তো করা যায়। কিন্তু ঠিকভাবে শেখাবেন কে? তাই, একটা কমপিউটার হাতে পেলে বই থেকে পড়ে পড়ে নিজে শিখে অন্যকেও শেখানো যায় এমন একটা পুস্তিকা প্রয়োজন। এখানে শেখার প্রাথমিক ভিত্তির বিস্তারিত আলোচনা রাখা হল সেই উদ্দেশ্যে।

এছাড়া, যাঁরা কমপিউটার সম্বন্ধে আরও জানতে চাইবেন, বা কমপিউটার মেরামতির ছোটখাটো কাজ শিখে নিতে চাইবেন, যাতে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও সেটুকু করে দেওয়া যায়, তাঁদের জন্য সংযোজনে কিছু প্রাথমিক আলোচনা রাখা হল। বইয়ের শেষে রাখা শব্দনির্দেশ থেকে নির্দিষ্ট পাতায় খুঁজে নেওয়া যাবে কমপিউটার সম্বন্ধে বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা।

পুস্তিকাটা বীরভূমের ফুলডাঙা গ্রামে বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে কমপিউটার চালানো শেখানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। আরও অনেকের শেখায় সহায়ক হতে পারলে এই পুস্তিকা সার্থক হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ফুলডাঙা বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বীরভূম

সুতনু ভট্টাচার্য

পাঠ পরিকল্পনা ও সূচি

পাঠ 1.	ডেস্কটপ কমপিউটার পরিচয়	5
পাঠ 2.	কমপিউটারের অভ্যন্তরে যাবতীয় তথ্য কীভাবে সঞ্চিত রাখা হয় — ফাইল ও ফোল্ডার	23
পাঠ 3.	প্রোগ্রামের সাহায্যে নতুন ফাইল তৈরি ও সেভ করা শেখা— পেইন্ট প্রোগ্রামটির ব্যবহার	44
পাঠ 4.	মাইক্রসফ্ট অফিস — ওয়ার্ড প্রোগ্রামটির ব্যবহার	58
পাঠ 5.	সংখ্যা নিয়ে হিসাবনিকেশ — এক্সেল প্রোগ্রামটির ব্যবহার	88

সংযোজন

1.	বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ও ইন্টারনেট সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা	109
2.	কমপিউটার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান	121
3.	কমপিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ	131

শব্দনির্দেশ

(প্রত্যেকটি পাঠের বিষয়সূচি প্রথম পাতায়, ও শেখা শব্দের তালিকা শেষ পাতায় আছে।)

মোটের ওপর নিয়মিত কমপিউটার ব্যবহার না করলে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে অনেকেরই হয়তো কমপিউটার নিয়মিত ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন বা সুযোগ থাকবে না। সেক্ষেত্রে এই শব্দ-তালিকা মাঝেমধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে রাখলে কমপিউটার ব্যাপারটা তেমন অজানা মনে হবে না।

পাঠ 1. ডেস্কটপ কমপিউটার পরিচয়

1.1 ডেস্কটপ কমপিউটারে কী কী থাকে

1.2 কমপিউটার কীভাবে চালু (স্টার্ট) করা হয়

1.3 ডেস্কটপ স্ক্রিন ও মেনু আইকন

1.4 মাউসকে নাড়িয়ে মাউস কারসারকে ডেস্কটপে পরিচালিত করা; মাউস বাটন ক্লিক — বাম ও ডান দিকের বাটন; কোনও মেনু আইটেমকে সিলেক্ট বা ঠিক করে নেওয়া

1.5 স্টার্ট মেনু সিলেক্ট করা ও কমপিউটারকে ঠিক ভাবে বন্ধ করা

1.6 প্রোগ্রাম উইনডো খোলা ও বন্ধ করা; মিনিমাইস, ম্যাক্সিমাইস/ রেসটোর, ও ক্লোস বাটন — উইনডোস এক্সপ্লোরার প্রোগ্রাম

1.7 প্রোগ্রাম উইনডোর আকার বড়-ছোট করা ও টেনে নিয়ে স্ক্রিনের বিভিন্ন স্থানে সরানো; উইনডোর স্ক্রোল বার —ভারটিকাল স্ক্রোল বার এবং হরিজন্টাল স্ক্রোল বার

1.8 একাধিক প্রোগ্রাম উইনডো খোলা ও পাশাপাশি রাখা, এবং এক একটিকে মিনিমাইস করে পশ্চাদপটে রাখা

1.9 কমপিউটার বন্ধ করার নিয়ম ও সমস্যা হলে কী করণীয়

1.10 কমপিউটারের স্ক্রিন সেভার ও স্ট্যান্ড বাই করে রাখা

অনুশীলন: পাঠ 1-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পাঠ 1. ডেস্কটপ কমপিউটার পরিচয়

1.1 ডেস্কটপ কমপিউটারে কী কী থাকে

যে কমপিউটারকে টেবিলের ওপরে রেখে আমরা কাজ করি তাকে **Desktop Computer** (ডেস্কটপ কমপিউটার) বলে। এতে মোটামুটি চারটি জিনিস থাকে, যেগুলিকে আরও ছোট করে একসাথে নিয়ে তৈরি হয় **Laptop Computer** (ল্যাপটপ কমপিউটার), যা আমরা কোলে নিয়ে বসেও কাজ করতে পারি। আমরা ডেস্কটপ কমপিউটার নিয়েই কমপিউটার চালানো শিখব।কমপিউটার বলতে এখানে আমরা **PC** বা **Personal Computer** (পার্সনাল কমপিউটার) বোঝাব।

দেখো এতে কী কী আছে। প্রথমে দেখো টিভির মতো দেখতে **Display Monitor** (ডিসপ্লে মনিটর), যার সামনের পর্দাটাকে **Screen** (স্ক্রিন) বলে। এর নাম ডিসপ্লে মনিটর, কারণ এটা আমাদের দেখায় কমপিউটারে কী কাজ হচ্ছে, বা হল। এই দেখানোর ফলে আমরা বুঝতে পারি কী আমাদের করতে হবে। তাই এটাই আমাদের মনিটর। ডিসপ্লে মনিটরের নিচে রাখা থাকে **Keyboard** (কীবোর্ড)। এতে আমরা টাইপ করে লিখে কমপিউটারকে বলতে পারি কী করতে হবে। কীবোর্ডের পাশে (ডানহাতিদের জন্য ডান পাশে) রাখা আছে ছোট একটা জিনিস যাকে আমরা হাতের তেলোয় ধরতে পারি। এর নাম **Mouse** (মাউস)। এর কাজ হল কীবোর্ড দিয়ে করার কিছু কাজ বা নির্দেশকে আরও সহজে করা। এর সাহায্যেও আমরা কমপিউটারকে বলি কী করতে হবে। মনে রাখতে হবে কীবোর্ডের সব কাজই কিন্তু মাউস দিয়ে করা যাবে না — যেমন, বর্ণ বা **Character** (ক্যারেকটার) টাইপ করে কিছু লেখা।

এরপর হল আসল জিনিসটা। একটা দাঁড় করানো বাক্স (কখনো ডিসপ্লে মনিটরের নিচে শোওয়ানোও হয়) বা **Cabinet** (ক্যাবিনেট), যার মধ্যে থাকে **Central Processing Unit** (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট) বা কমপিউটার **CPU** (সিপিইউ)। এটাই হল কমপিউটার, যার পিছনে তার দিয়ে জোড়া থাকে ডিসপ্লে মনিটর, কীবোর্ড, আর মাউস। সিপিইউটার পেছনে **Power** (পাওয়ার) বা বিদ্যুৎ সংযোগের তারও থাকে। লক্ষ করে দেখ সিপিইউয়ের সামনে একটি বোতাম বা **Power button** (পাওয়ার বাটন), আছে, যেটা টিপে দিলে বিদ্যুৎ আসে ও কমপিউটার চালু হয় (এটিকে বেশ অনেকক্ষণ টিপে ধরে রাখলে আবার বিদ্যুৎ বন্ধও হয়ে যায়)। বিভিন্ন ক্যাবিনেটে এই বাটনটা একটু এদিক-ওদিকে থাকতে পারে। এটাকে আমরা ছবিতে দেখিয়েছি পাওয়ার বাটন নামে।

এবারে আমরা এই চারটি জিনিসের মূল কাজের ধরনটাকে সংক্ষেপে বুঝে নিই। আমরা যা করতে বলি সেই মূল কাজটা তো করে কমপিউটারের সিপিইউ। কিন্তু আমরা যা যা করতে বলি কমপিউটারকে, অর্থাৎ যা নির্দেশ দিই, তা দিই কী করে। এটা আমরা কমপিউটারকে দিই কীবোর্ড অথবা মাউস দিয়ে। এই নির্দেশগুলি কমপিউটারের ভেতরে আসে তাই এগুলো হল কমপিউটারের ইনপুট আর এই ইনপুট দেওয়ার জিনিসগুলোকে (এখানে কীবোর্ড ও মাউস) বলে **Input Device** (ইনপুট ডিভাইস)। এরপর এই নির্দেশ অনুযায়ী কমপিউটার কাজটি করে যা পায় তাকে দেখায় ডিসপ্লে মনিটরের স্ক্রিনে। এটা হল কমপিউটারের আউটপুট। সুতরাং, ডিসপ্লে মনিটর হল একটি **Output Device** (আউটপুট ডিভাইস)।

এখানে ছবিতে দেখানো হয়নি, এমন আর একটি আউটপুট ডিভাইস কমপিউটারে লাগানো যায়, যার নাম হল **Printer** (প্রিন্টার)। প্রিন্টার কমপিউটারের আউটপুট, যা স্ক্রিনে দেখা যায় (লেখা বা ছবি) কাগজে ছেপে দেয়। অন্যান্য আরও কিছু ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হয় (স্পীকার, রেকর্ডার, ক্যামেরা, স্ক্যানার, ইত্যাদি) যার ব্যবহার আমরা পরে জানব।

এছাড়া কমপিউটারে থাকে **Digital** (ডিজিটাল) পদ্ধতিতে লিখে তথ্য সঞ্চয় বা জমিয়ে রাখার জন্য **Storage Device** (স্টোরেজ ডিভাইস)। এমন একটি স্টোরেজ ডিভাইস কমপিউটারের ভেতরেই রাখা থাকে, যাকে বলা হয় **Hard Disk** (হার্ড ডিস্ক), আর চালানোর জিনিসটাকে বলে **Drive** (ড্রাইভ)। তাই এক কথায় বলা হয় **Hard Disk Drive** (হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ) । যে ডিভাইসগুলি কমপিউটারে প্রয়োজন

মতো বাইরে থেকে লাগানো যায় তাকে বলে **Removable Storage Device** (রিমুভেবল স্টোরেজ ডিভাইস)। এগুলো হল **CD/DVD** (সিডি/ডিভিডি) ও **Pen Drive** (পেন ড্রাইভ), যেগুলো চালানোর ব্যবস্থাগুলো হল **CD/DVD Drive** (সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ), ও **USB Port** (ইউএসবি পোর্ট) । এই সবই হল কমপিউটারের **Hardware** (হার্ডওয়্যার)।

1.2 কমপিউটার কীভাবে চালু (স্টার্ট) করা হয়

কমপিউটার চালু করা খুবই সহজ। বিদ্যুৎ সংযোগটা আছে কিনা দেখে নিয়ে সিপিইউয়ের সামনের বোতাম বা পাওয়ার বাটনটা একবার টিপলেই কমপিউটার চালু হয়ে যাবে—সিপিইউয়ে আলো জ্বলবে, কীবোর্ড ও মনিটরে আলো জ্বলবে, স্ক্রিনে কিছু লেখা ফুটে উঠে দু-তিন সেকেন্ড পরে চলেও যাবে ও সিপিইউ থেকে আস্তে একটা পিক্ আওয়াজ আসবে। এই আওয়াজটার মানে হল কমপিউটার ঠিকঠাক চালু হল, যাকে বলে **Boot** (বুট) করা । এটা না হওয়ার মানে হল কমপিউটারের ভেতরে কিছু সমস্যা হয়েছে। এরপর কমপিউটার একে এক কাজ করার জন্য যা যা তার প্রয়োজন তা নিজেই চালু করে নেবে ও ডিসপ্লে মনিটরে আসবে কাজ আরম্ভের স্ক্রিন।

1.3 ডেস্কটপ স্ক্রিন ও মেনু আইকন

ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ, যেকোনও কমপিউটারে প্রথমেই রাখা হয় কমপিউটার চালানোর মূল ব্যবস্থাটা। এই ব্যবস্থাটাকে বলে কমপিউটারটার **Operating system** (অপারেটিং সিসটেম) যা এক বিশেষ ধরনের **Program** (প্রোগ্রাম) বা **Software** (সফটওয়্যার) । একটা অপারেটিং সিসটেম হল **Microsoft Windows** (মাইক্রসফট্ উইন্ডোস)। অন্য অপারেটিং সিসটেম হল, **Mac** (ম্যাক). **Linux** (লিনাক্স)। আমরা এখানে কমপিউটার চালানো দেখাব উইন্ডোস সিসটেম দিয়ে। বাজারে যে উইন্ডোস সিসটেম সফটওয়্যার মেলে তা মাইক্রসফট কোম্পানি ক্রমাগত পালটে নতুন নতুন মডেলে বিক্রি করে। এইগুলোকে বলে **Program Version** (প্রোগ্রাম ভারশন)। এখন এসেছে উইন্ডোস ভারশন 8 ও ভারশন 10, 11। শেখার সুবিধার জন্য আমরা উইন্ডোস ভারশন 7 ব্যবহার করব। পরের ভারশনগুলোয় প্রথম স্ক্রিনটাতে অন্য ছবি আসে, তাছাড়া প্রায় একই, কিন্তু সমস্যা হল নিয়মিত ইন্টারনেটে আপডেট করতে হয়।

কমপিউটার চালু করার পর প্রথম যে স্ক্রিনটা আসে তার ছবিটা দেওয়া আছে। মনে রাখতে হবে এই ছবিটা অন্য রকমও হতে পারে, কারণ এটাকে আমরা ইচ্ছে

মতো করে নিতে পারি, যা এখন শেখা জরুরি নয়। নীল রঙের পুরো ছবিটাকে বলা হয় **Desktop background** (ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড)।

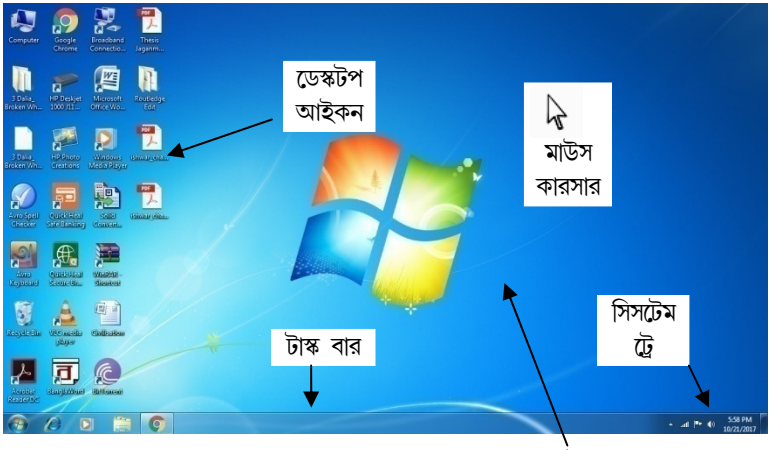

লক্ষ করো বাঁ দিকে সারি দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট ছবি, যেগুলো হল বিভিন্ন কাজ করানোর প্রোগ্রামের বা কমপিউটারে সঞ্চিত রাখা আছে এমন বিশেষ কয়েকটি জায়গা বা তথ্যের স্থানগুলোর প্রতিমূর্তি বা **Icon** (আইকন)। এই আইকনগুলো আমরা প্রয়োজনমতো ডেস্কটপে এনে রাখি যাতে চট করে কাজ চালু করতে পারি। কী করে আনা যায় তা পরে শিখব।

স্ক্রিনের নিচের দিকে ডান কোনায় আছে **System Tray** (সিসটেম ট্রে), যেখানে দেখানো যায় যেসব প্রোগ্রাম চালু আছে, যেমন দিন ও সময় দেখানো, আওয়াজ বেশি কম করা, ইত্যাদি। স্ক্রিনের নিচের দিকে মোটা লাইনটাকে বলে **Task Bar** (টাস্ক বার), যেখানে আমরা রাখি খুব বেশি ব্যবহার করা হয় এমন প্রোগ্রাম চালু করার আইকনগুলো। আবার অন্য যেকোনও প্রোগ্রাম চালু করলে তারও আইকনটা দেখানো হয় এই টাস্ক বারে।

এরপর লক্ষ করো ডেস্কটপ স্ক্রিনের কোনও একটি জায়গায় মোটা তির চিহ্নটি। একে বলে মাউস **Cursor** (কারসার)। কারসার মানে হল একটি চিহ্ন, যা এদিকে ওদিকে সরিয়ে কোনও স্থানকে নির্দিষ্ট করা যায়। মাউসটা ধরে নাড়িয়ে দেখ স্ক্রিনে

মাউস কারসারটিও নড়ছে, যেমন মাউসটা নাড়ানো হচ্ছে। কারসারের চিহ্নটা তির চিহ্নের বদলে অন্যকিছুও করা যায়।

1.4 মাউসকে নাড়িয়ে মাউস কারসারকে ডেস্কটপে পরিচালিত করা; মাউস বাটন ক্লিক — বাম ও ডান দিকের বাটন; কোনও মেনু আইটেমকে সিলেক্ট বা ঠিক করে নেওয়া

এবারে মাউসকে নাড়িয়ে মাউস কারসারকে স্ক্রিনের এদিকে ওদিকে নিয়ে যাওয়া অভ্যেস করতে হবে। প্রথমে একটা একটা করে টাস্কবারের আইকনগুলোর ওপর কারসার এনে খানিকক্ষণ রেখে দেখো যে আইকনটি কী তা লেখা ফুটে উঠছে। একই ভাবে দেখো ডানদিকের নিচে সিসটেম ট্রের লেখাগুলোতে কারসারকে রাখলে সেগুলো কী তা লেখা ফুটে ওঠে। কারসারটাকে বাঁদিকের এক একটি আইকনের ওপরে এনে রেখে দেখো, আইকনটি আলোকিত হচ্ছে যাকে বলা হয় **Highlight** (হাইলাইট) করা। এর ফলে আমরা বুঝতে পারব কারসার কোন্ আইকনটাতে আছে। এরপর দেখো, মাউসের ওপরের বাঁদিকে আর ডানদিকে এক একটা আঙুল দিয়ে হাল্কা চাপ দিলেই মাউসে একটা ক্লিক আওয়াজ হয়। একে বলে মাউসে **Left click** (লেফট ক্লিক) আর **Right click** (রাইট ক্লিক) করা। লেফট আর রাইট ক্লিকের কাজ আলাদা। রাইট ক্লিক করে কী করা হয় তা আমরা পরে শিখব। আগে লেফট ক্লিক-এর ব্যবহার দেখে নেব। আমরা ক্লিক করা বলতে লেফট ক্লিক বোঝাবো। মনে রেখো আমরা চাইলে লেফট আর রাইট বাটনের কাজটা উল্টেও নিতে পারি।

কারসারকে ডেস্কটপের কোনও একটি আইকনে নিয়ে এসো। আইকনটি হাইলাইট হবে, কিন্তু কারসার সরালেই এই আইকনটার হাইলাইট চলে যাবে ও অন্য কোনও আইকনে কারসার নিয়ে গেলে সেটি হাইলাইট হবে। এবার কোনও একটি আইকনে কারসার নিয়ে এসে মাউস লেফট ক্লিক করো একবার। দেখবে যে আইকনটির হাইলাইট থেকেই যাচ্ছে কারসার অন্য কোথাও সরালেও, যতক্ষণ না আবার একবার লেফট ক্লিক করা হচ্ছে অন্য কোথাও। এর মানে ওই আইকনটি আমরা ঠিক করেছি বা **Select** (সিলেক্ট) করেছি একবার ক্লিক করে।

মনে রাখো, ডেস্কটপের যে কোনও একটি আইকন একবার ক্লিক করলে সিলেক্ট হয়, আর চট করে পরপর দুবার বা **Double click** (ডাবল ক্লিক) করলে সেটি চালু হয়। কিন্তু টাস্কবারে রাখা কোনও কিছু একবার ক্লিক করলেই চালু হবে।

1.5 স্টার্ট মেনু সিলেক্ট করা ও কমপিউটারকে ঠিক ভাবে বন্ধ করা

যে কোনও যন্ত্র চালু করলেই আগে জেনে নিতে হয় সেটা বন্ধ করা যাবে কী ভাবে। অর্থাৎ, কোথাও ঢুকলে সেখান থেকে বের হওয়ার রাস্তাটাও জেনে নিতে হবে। এবার দেখো, কী ভাবে কমপিউটার বন্ধ করবে।

ডেস্কটপ স্ক্রিনের নিচের দিকে টাস্ক বারের বাঁদিকের কোনায় দেখো একটি গোলের মধ্যে উইনডোস আইকনটা আছে। কারসারকে এনে এর ওপরে রাখ। দেখবে Start (স্টার্ট) লেখাটা ফুটে উঠছে। এটাকে বলে **Start Menu** (স্টার্ট মেনু) আইকন। এবার এটাতে একবার ক্লিক করো। একটা **List** (লিস্ট) খুলবে যেমন ছবিতে দেখানো আছে। এই লিস্টটার বাঁদিকে দেখানো থাকে কমপিউটারে আছে এমন কিছু প্রোগ্রাম (আরও প্রোগ্রাম থাকতে পারে যা লিস্টে নেই), আর ডানদিকে দেখানো থাকে কমপিউটারে সঞ্চয় করে রাখার কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা ফোল্ডার। ফোল্ডার ব্যাপারটা কী আমরা পরে বলব।

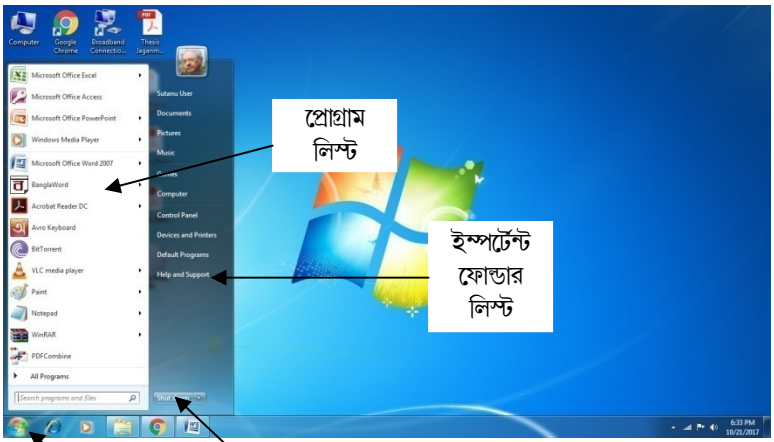

কারসারকে লিস্টের মধ্যে ওপরে নিচে ও পাশে নিয়ে দেখো এক একটি **List item** (লিস্ট আইটেম) হাইলাইট হচ্ছে। এগুলি একবার ক্লিক করলেই চালু হয়ে যাবে, কিন্তু এখনি তা করা ঠিক হবে না। প্রোগ্রাম আইটেমগুলোর কয়েকটার ডানপাশে দেখবে তিরের ফলা চিহ্ন আছে। এই আইটেমগুলোতে কারসার রাখলে দেখা যাবে ওই প্রোগ্রামে সদ্য যে কাজ করা হয়েছে তার তালিকা। লিস্টের ডান ধারে নিচে দেখো

Shut down (শাট ডাউন) আইটেমটি আছে। কারসার ওখানে নিয়ে গিয়ে একবার ক্লিক করো। কমপিউটার বন্ধ হবে। **মনে রেখো, কমপিউটারকে সর্বদা এইভাবেই বন্ধ করতে হবে।**

1.6 প্রোগ্রাম উইনডো খোলা ও বন্ধ করা; মিনিমাইস, ম্যাক্সিমাইস/ রেসটোর, ও ক্লোস বাটন — **উইনডোস এক্সপ্লোরার** প্রোগ্রাম

এবারে শিখব কোনও একটি প্রোগ্রামকে কী করে চালু ও বন্ধ করা যায়। যে কোনও প্রোগ্রাম দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি। শেখার সুবিধার জন্য আমরা কমপিউটারে কী কী রাখা আছে তা দেখার প্রোগ্রামটি চালু করে দেখব। ডেস্কটপ আইকনগুলোর মধ্যে দেখো Computer (কমপিউটার) লেখা একটি আইকন আছে (সাধারণত বাঁ পাশে ওপর দিকে রাখা থাকে)। কারসার এখানে এনে ডাবল ক্লিক করো। প্রোগ্রামটা চালু হয়ে স্ক্রিনে কী আসবে তা ছবিতে দেখানো আছে।

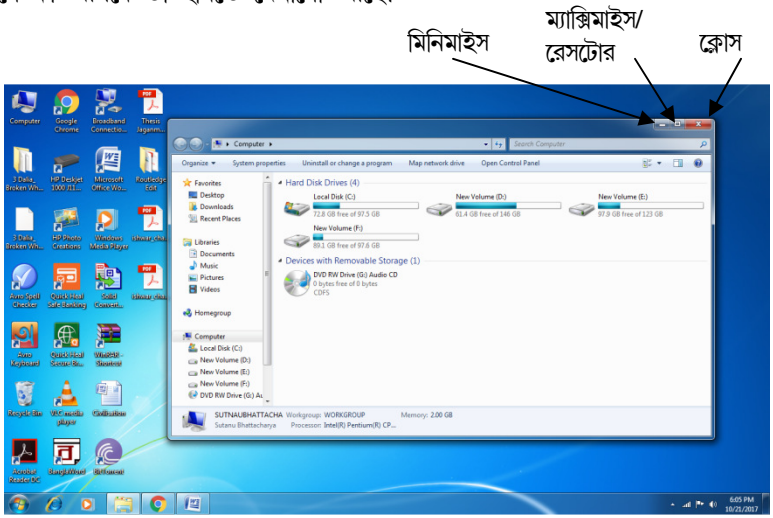

এই প্রোগ্রামটা হল টাস্ক বারে রাখা **Windows Explorer** (উইনডোস এক্সপ্লোরার) প্রোগ্রামটাই। তাই ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে এটা চালু করা মাত্র টাস্ক বারে রাখা এই প্রোগ্রাম আইকনটা হাইলাইট হয়ে যাবে। আমরা টাস্ক বারের এই আইকনটাকে একবার ক্লিক করেও প্রোগ্রামটা চালু করতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমরা পরে শিখব।

ডেস্কটপ স্ক্রিনের ওপরে যেটা এল তাকে আমরা বলব, চালু করা এই প্রোগ্রামটার **Program Window** (প্রোগ্রাম উইনডো)। এই উইনডোতে অনেক কিছু দেখাচ্ছে। কিন্তু আপাতত সেসব না দেখে, লক্ষ করো উইনডোটার ওপরদিকের একদম ডান কোনায় পাশাপাশি তিনটে বাটন আছে। কারসারকে এক এক করে এই তিনটের ওপরে নিয়ে কিছুক্ষণ রাখো, দেখবে এই বাটনগুলো কী তা লেখায় ফুটে উঠবে। প্রথমটাতে আসবে **Minimise** (মিনিমাইস), দ্বিতীয়টাতে আসবে **Maximise** (ম্যাক্সিমাইস) বা উইনডোটি ম্যাক্সিমাইস করাই থাকলে আসবে **Restore** (রেসটোর) । শেষেরটাতে আসবে **Close** (ক্লোস)।

প্রথমেই ক্লোস বাটনটায় একবার লেফট ক্লিক করে দেখো, প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবে। এইভাবে কয়েকবার প্রোগ্রামটা চালানো আর বন্ধ করা অভ্যেস করে নাও। মনে রেখো সর্বদা এই বাটনটায় লেফট ক্লিক করে প্রোগ্রাম বন্ধ করা যায় (কীবোর্ড দিয়েও করা যায় কীবোর্ডের ALT বাটনটা টিপে রেখে একবার F4 বাটনটা টিপলে, যা আমরা পরে শিখব)।

এবার দেখো মিনিমাইস বাটনটাতে লেফট ক্লিক করলে কী হয়। প্রোগ্রাম উইনডোটা স্ক্রিনের ওপর থেকে চলে যাবে, কিন্তু প্রোগ্রামটা চালুই থাকবে। এটা এখন থাকবে টাস্ক বারে। একে বলে ছোট বা মিনিমাইস করে ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রোগ্রামকে চালু রাখা। টাস্ক বারে রাখা প্রোগ্রামটার আইকনে কারসার এনে দেখ, উইনডোটা ছোট করে ভেসে উঠবে। আইকনটাকে একবার লেফট ক্লিক করলেই আবার প্রোগ্রাম উইনডোটা স্ক্রিনের ওপরে চলে আসবে। এটা কয়েকবার অভ্যেস করে নাও।

ম্যাক্সিমাইস বাটনটাতে ক্লিক করলে উইনডোটা পুরো ডেস্কটপ স্ক্রিন জুড়ে বড় হয়ে যাবে। এবার এই বাটনটায় কারসার রাখলে লেখা ফুটবে রেসটোর, মানে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। এই বাটনটায় এবার ক্লিক করে দেখ আগের উইনডোটাই ফিরে আসবে। এটাও কয়েকবার অভ্যেস করে নাও।

1.7 প্রোগ্রাম উইনডোর আকার বড়-ছোট করা ও টেনে নিয়ে স্ক্রিনের বিভিন্ন স্থানে সরানো; উইনডোর স্ক্রোল বার —ভারটিকাল স্ক্রোল বার এবং হরিজন্টাল স্ক্রোল বার

ডেস্কটপে প্রোগ্রামের খোলা উইনডোটাকে আমরা ছোট বড় করে নিতে পারি ও তাকে স্ক্রিনের এদিকে ওদিকে সরাতেও পারি। উইনডোটার যে ফ্রেম বা ধার আছে পাশাপাশি বাঁদিকে বা ডানদিকে ঠিক তার ওপরে কারসারকে এনে রাখো। দেখবে পাশাপাশি

বিপরীতমুখি দুটো তিরচিহ্ন আসবে। একই ভাবে ওপরে ও নিচে উইনডোর ফ্রেমের যে ধার আছে ঠিক সেখানে কারসার নিয়ে গিয়ে দেখো, এবার তিরচিহ্ন আসবে ওপরে-নিচে। এই তির চিহ্নগুলোর মানে হল আমরা উইনডোর ফ্রেমকে পাশাপাশি টেনে বা ওপরে-নিচে টেনে ছোট বড় করতে পারি। এটা করতে কারসারকে ফ্রেমের ধারে রেখে তির চিহ্নটা এলে মাউসের লেফট বাটনটা চেপে রেখে পাশাপাশি বা ওপর-নিচে মাউসকে সরাতে হবে অল্প অল্প করে। এটা কয়েকবার অভ্যেস করে নিতে হবে।

কোনও কারণে এমন হতেই পারে যে প্রোগ্রাম উইনডোটা এতটাই স্ক্রিনের ধারে বা ওপরে বা নিচে সরে গেছে যে তার অনেকটাই দেখা যাচ্ছে না। এরকম হলে মিনিমাইস, ম্যাক্সিমাইস, ক্লোস বাটনগুলোও দেখা যাবেনা ও তাই কারসারকে সেখানে নিয়ে যাওয়াও যাবে না। এমনটা হলে উইনডোটাকে আবার পছন্দমতো ঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এটা করতে উইনডোর ওপর দিকে যে ফ্রেমের মোটা জায়গাটা আছে, সেখানে কারসারকে নিয়ে গিয়ে মাউসের লেফট বাটন চেপে রেখে মাউসকে সরিয়ে দেখতে হবে উইনডোটা কোথায় সরছে। পছন্দমতো জায়গায় এনে লেফট বাটনটা ছেড়ে দিতে হবে। একে বলা হয় মাউস চেপে **Drag** (ড্র্যাগ) করা বা টানা। এটা কয়েকবার অভ্যেস করতে হবে।

প্রোগ্রাম উইনডোটাকে বেশি ছোট করে নিলে এমন হয় যে উইনডোটার মধ্যে সবকিছুকে দেখানো যায় না। তখন ওপর-নিচে বা পাশে আরও যা কিছু থাকে তা দেখার জন্য আপনা থেকেই উইনডোর ফ্রেমের ডান ধারে ওপরনিচে একটা ও ফ্রেমের

নিচের অংশে পাশাপাশি আরেকটা বার (bar) এসে যায়। ডান ধারের ওপর-নিচের বার-টাকে বলে **Vertical Scroll Bar** (ভারটিকাল স্ক্রোল বার), আর নিচের পাশাপাশি বার-টাকে বলে **Horizontal Scroll Bar** (হরিজন্টাল স্ক্রোল বার)। লক্ষ করো, ভারটিকাল স্ক্রোল বারের দুই প্রান্তে তির চিহ্ন আছে ওপর ও নিচ-মুখি, আর হরিজন্টাল স্ক্রোল বারের দুই প্রান্তে তির চিহ্ন আছে ডানদিক ও বাঁদিক-মুখি। মাউস কারসারকে এই তির চিহ্নে রেখে পর পর ক্লিক করে গেলে উইনডোর ভেতরের লেখাগুলো সরবে নিচ থেকে ওপরে বা ওপর থেকে নিচে, আর বাঁদিক থেকে ডান দিকে বা ডান দিক থেকে বাঁদিকে।

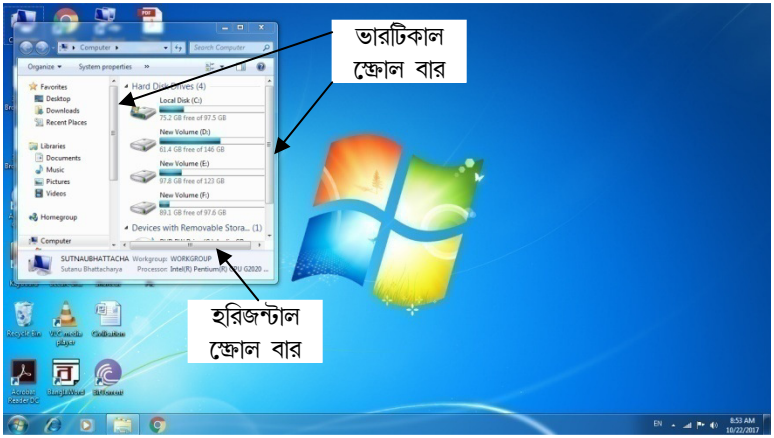

তাড়াতাড়ি অনেকটা করে সরাতে হলে স্ক্রোল বারের ওপরেই কারাসার রেখে লেফট বাটনটা চেপে বারটাকেই টেনে বা ড্র্যাগ করে ওপর-নিচে বা ডাইনে-বাঁয়ে করা যাবে। ওপরে বা নিচে স্ক্রোল করার আরেকটা উপায় হল মাউসের দুটো বাটনের মাঝে যে চাকা মতো আছে, যাকে **Mouse Scroll Button** (মাউস স্ক্রোল বাটন) বলে, সেটা আঙুল দিয়ে ওপরের দিকে বা নিচের দিকে ঘোরানো।

1.8 একাধিক প্রোগ্রাম উইনডো খোলা ও পাশাপাশি রাখা, এবং এক একটিকে মিনিমাইস করে পশ্চাদপটে রাখা

উইনডো মানে জানালা। উইনডো সিসটেমে আমরা একাধিক প্রোগ্রাম চালিয়ে তাদের উইনডোগুলোকে ডেস্কটপ স্ক্রিনে রাখতে পারি, এক একটি জানালা হিসাবে। এতে

একাধিক প্রোগ্রামে পর পর কাজের সুবিধা হয়। ডেস্কটপে যে প্রোগ্রাম আইকনগুলো আছে তার যে কোনও তিনটিকে এক এক করে চালাও, আইকনগুলোতে ডাবল ক্লিক করো। দেখো যে তিনটে প্রোগ্রাম উইনডোই ডেস্কটপ স্ক্রিনে আসবে, সেইসঙ্গে নিচের টাস্ক বারেও এই তিনটি প্রোগ্রামের আইকন এসে যাবে।।

একটার ওপরে আরেকটা উইনডো চেপে থাকলে, সবচেয়ে ওপরে যে উইনডোটা আছে সেটা হাইলাইট করা, অর্থাৎ সেটি সক্রিয়, যার ওপরে এখন কাজ করা যাবে। পিছনে পড়ে থাকা যে কোনও একটি উইনডোকে ক্লিক করলে, সেটাই সবচেয়ে ওপরে চলে এসে সক্রিয় হয়ে যাবে। উইনডোগুলোকে প্রয়োজন মতো ছোট করে ও টেনে বা ড্র্যাগ করে পাশাপাশি বা ওপর-নিচেও রাখা যাবে।

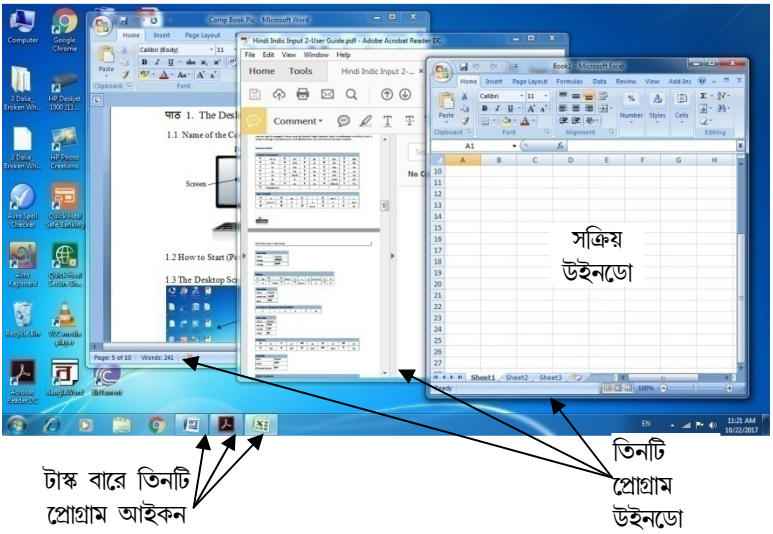

এবারে মিনিমাইস বাটনটিতে ক্লিক করে একে একে তিনটি উইনডোকেই বন্ধ করে দাও। ডেস্কটপ স্ক্রিনে আর উইনডোগুলো দেখা যাবে না, কিন্তু প্রোগ্রাম চালুই থাকবে, বন্ধ হয়ে যাবে না। এরা চালু থাকবে পশ্চাদপটে বা ব্যাকগ্রাউন্ডে, যা বোঝা যাবে টাস্কবারে এদের আইকনগুলো থাকছে দেখে।

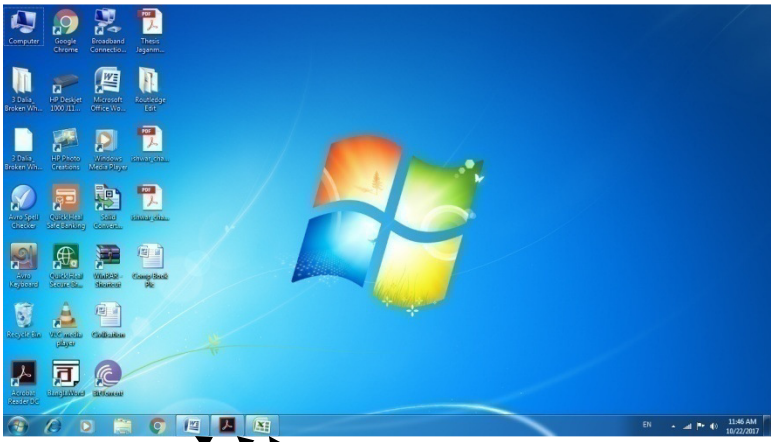

1.9 কমপিউটার বন্ধ করার নিয়ম ও সমস্যা হলে কী করণীয়

- কমপিউটার বন্ধ করার আগে যে সমস্ত প্রোগ্রাম চলছে বা মিনিমাইস করে রাখা হয়েছে পশ্চাদপটে, সেগুলি বন্ধ করে নেওয়া উচিত।
- এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রোগ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন না হলে না চালানোই ভাল। অনেকগুলি প্রোগ্রাম একসাথে খুলে ফেললে কমপিউটারের কাজ আটকে যেতে পারে, যাকে বলা হয় **Hang** (হ্যাঙ) করা।
- অনেক কাজ বা একাধিক প্রোগ্রামে একসঙ্গে কাজ করতে হলে মাঝে মধ্যেই, 3–4 মিনিট অন্তর করা কাজকে **Save** (সেভ) করে নেওয়া ভাল। সেভ কী করে করা হয় তা পরে বলা হবে।

কমপিউটার হ্যাঙ করে গেল কী করতে হবে

কমপিউটার হ্যাঙ করে গেলে মাউস কাজ করবে না। তখন কীবোর্ড-এর **Alt+F4** (অল্ট+এফ-ফোর), মানে অল্ট বাটনটা চেপে রেখে এফ-ফোর বাটনটা একবার টিপতে হবে। কমপিউটার বন্ধ করার যে **Message** (মেসেজ) বা বার্তাটি স্ক্রিনে আসবে সেই

অনুসারে কমপিউটার বন্ধ করতে হবে। এখানে কীবোর্ডের **Tab Key** (ট্যাব বাটন) ব্যবহার করে বন্ধ করার বাটনটাতে গিয়ে **Enter Key** (এন্টার বাটন) টিপতে হবে।

(Alt+F4) কাজ না করলে, আরেকটি উপায় হল **Ctrl+Alt+Del** (সিটিআরএল+অল্ট+ডেল) দিয়ে চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে যে মেসেজটি স্ক্রিনে আসবে তার ডানদিকের নিচের কোনায় বন্ধ করা বাটনটি পাওয়া যাবে। কীবোর্ডের Tab বাটনটি ব্যবহার করে ওই বাটনটিতে গিয়ে Enter (এন্টার) টিপতে হবে। এর কোনওটিই কাজ না করলে কমপিউটারের বিদ্যুতের সুইচটি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া বা অন্য কোনও কারণে কমপিউটার ভুলভাবে বন্ধ করা হলে পুনরায় চালানোর সময় প্রথমেই **মেসেজ** (Message) বা বার্তা আসবে যে আগের বার কমপিউটার ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। বার্তাটিতে প্রশ্ন থাকবে— Do you wish to run the computer in

a. Safe Mode;
b. Safe mode with networking;
c. Safe mode with command prompt;
d. Or to start the Windows normally

এখানে মাউস কাজ করবে না। কীবোর্ডের **Cursor Key** (কারসার কীই) (ওপরে নিচে ও ডাইনে বাঁয়ে তির চিহ্নগুলো) ব্যবহার করে সর্বদা **Safe Mode** (সেফ মোড)-কে নির্বাচন করা ভাল। Safe Mode নির্বাচন করে Enter টিপতে হবে। একটু অপেক্ষার পর সেফ মোডে স্ক্রিনটি আসবে বড় বড় হয়ে। এবারে মাউস কাজ করবে ও তা দিয়ে আমরা কমপিউটারকে ঠিকভাবে Shut Down বা পুনরায় চালু, **Restart** (রিস্টার্ট) করতে পারব।

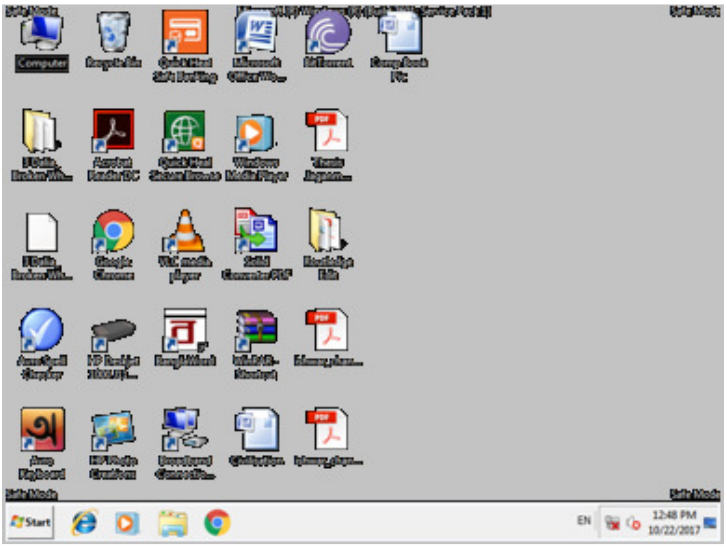

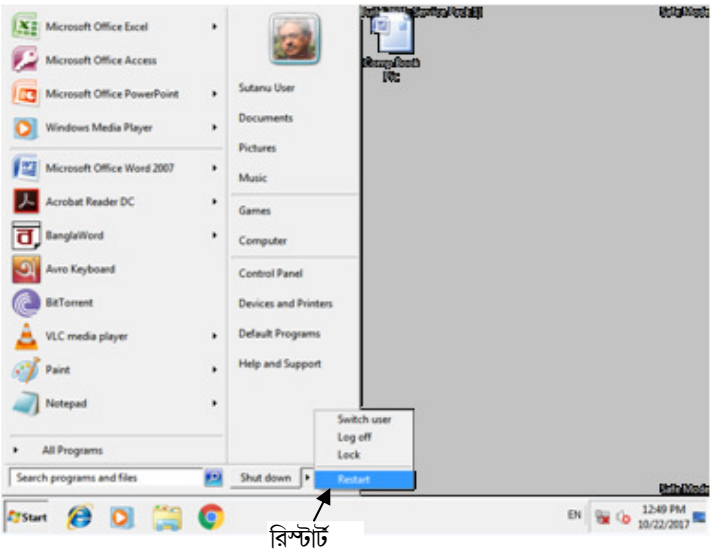
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Access
Microsoft Office PowerPoint
Windows Media Player
Microsoft Office Word 2007
Acrobat Reader DC
BanglaWord
Avro Keyboard
BitTorrent
VLC media player
Paint
Notepad
All Programs
Search programs and files
Sutanu User
Documents
Pictures
Music
Games
Computer
Control Panel
Devices and Printers
Default Programs
Help and Support
Shut down
Switch user
Log off
Lock
Restart
Start
EN
12:49 PM
10/22/2017

রিস্টার্ট

1.10 কমপিউটারের স্ক্রিন সেভার ও স্ট্যান্ড বাই করে রাখা

এমন যদি হয় যে কমপিউটারে বেশ কিছুক্ষণ (5-7 মিনিট) হল কোনও কাজ করা হচ্ছে না, তাহলে ডিসপ্লে মনিটরের স্ক্রিনের ছবিটা পাল্টায় না, একই ছবি থেকে যায় অতটা সময় ধরে। এটা হলে স্ক্রিনটার ক্ষতি হয়। তাই আমরা কমপিউটারে একটা বিশেষ প্রোগ্রাম দিয়ে রাখি, যার ফলে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে স্ক্রিনে একই ছবি থাকলে, আপনা থেকেই স্ক্রিনের ছবি ক্রমাগত পাল্টাতে শুরু করে। এই প্রোগ্রামটাকে বলে **Screen Saver** (স্ক্রিন সেভার) যা স্ক্রিনকে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটা একবার কমপিউটারে **Install** (ইন্স্টল) করে নিলে মানে প্রতিষ্ঠা বা বসিয়ে নিলে, কমপিউটার চালু করার সাথে সাথে প্রতিবারই এটা পশ্চাতে আপনি চালু হয়ে থাকবে। স্ক্রিন সেভারে কোন ছবি ও কত সময় পর থেকে আসবে তা আমরা ঠিক করে দিতে পারি। কীভাবে এটা করা যায় তা পরে শিখব। সুতরাং, কমপিউটার স্ক্রিনে আপনা থেকেই নানান ছবি পাল্টে পাল্টে আসছে দেখলে বুঝব, স্ক্রিন সেভার চলছে। এমনটা হলে মাউসকে একটু নাড়ালেই বা কীবোর্ডের যে কোনও বাটন টিপলেই স্ক্রিন সেভারটা চলে যাবে ও আমরা ডেস্কটপ স্ক্রিনটা পেয়ে যাব।

কমপিউটারে আরও একটা ব্যবস্থা করা থাকে। বেশ অনেকক্ষণ কমপিউটারে কোনও কাজ না হলে তো অযথা তাকে চালু অবস্থায় রাখা ঠিক নয়। ধরা যাক তুমি কমপিউটারে কাজ করতে করতে অন্য কোনও কাজের দরকারে উঠে গেলে। সেই কাজে লেগে গেল অনেক সময়। বা মনে করো তুমি কমপিউটার বন্ধ করতে ভুলে গেছিলে। তাহলে কী হবে? প্রথমে তো স্ক্রিন সেভার চালু হবে স্ক্রিনটাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু কমপিউটার তো চালুই থাকবে। সেইজন্য যেটা করা যায় তা হলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া—যেমন 10 মিনিট পরে ডিসপ্লেটা বন্ধ হয়ে যাবে, একে বলে **Turn off the display** (টার্ণ অফ দ্য ডিসপ্লে), আর 20 মিনিট পরে হার্ড ডিস্কও চলা বন্ধ হয়ে যাবে, যাকে বলা হয় **Put the computer to sleep** (পুট দ্য কমপিউটার টু স্লীপ)। এই অবস্থায় কমপিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগটা থাকে কিন্তু কমপিউটার চালু থাকে না । দেখবে কমপিউটারের সব কিছু বন্ধ থাকলেও পাওয়ার বাটনটায় আলো জ্বলছে। একে **Sleep Mode** (স্লীপ মোড) বা স্ট্যান্ড বাই মোড বলা হয়। এই অবস্থায় মাউস নাড়িয়ে বা কীবোর্ডের কোনও বাটন টিপেও যদি দেখো কমপিউটারে কিছু হচ্ছে না, তাহলে পাওয়ার বাটনটা একবার টিপতে হবে। তবেই কমপিউটার আবার চালু হয়ে যাবে।

অনুশীলন: পাঠ 1-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পর পর যেভাবে শেখা হয়েছে, শব্দগুলো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো পর পর পড়ে মনে করো, পাঠে কী বলা হয়েছে। মনে ঠিক না এলে আবার পাঠের ওই জায়গাটা দেখে নাও।

Desktop Computer (ডেস্কটপ কমপিউটার)
Laptop Computer (ল্যাপটপ কমপিউটার)
Display Monitor (ডিসপ্লে মনিটর)
Screen (স্ক্রিন)
Keyboard (কীবোর্ড)
Mouse (মাউস)
Character (ক্যারেকটার)
Cabinet (ক্যাবিনেট)
Central Processing Unit (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট)
CPU (সিপিইউ)
Power (পাওয়ার)
Power button (পাওয়ার বাটন)
Input Device (ইনপুট ডিভাইস)
Output Device (আউটপুট ডিভাইস)
Printer (প্রিন্টার)
Digital (ডিজিটাল)
Storage Device (স্টোরেজ ডিভাইস)
Hard Disk (হার্ড ডিস্ক)
Drive (ড্রাইভ)
Hard Disk Drive (হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ)
Removable Storage Device (রিমুভেবল স্টোরেজ ডিভাইস)
CD/DVD (সিডি/ডিভিডি)
Pen Drive (পেন ড্রাইভ)
USB Port (ইউএসবি পোর্ট)
Hardware (হার্ডওয়্যার)
Boot (বুট)
Program (প্রোগ্রাম)
Software (সফটওয়্যার)
Operating system (অপারেটিং সিসটেম)
Microsoft Windows (মাইক্রসফট্ উইন্ডোস)
Linux (লিনাক্স)
Program Version (প্রোগ্রাম ভারশন)
Desktop background (ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড)
Icon (আইকন)
System Tray (সিসটেম ট্রে)
Task Bar (টাস্ক বার)
Cursor (কারসার)
Highlight (হাইলাইট)
Left click (লেফট ক্লিক)
Right click (রাইট ক্লিক)
Select (সিলেক্ট)
Double click (ডাবল ক্লিক)
Start Menu (স্টার্ট মেনু)
List (লিস্ট)
List item (লিস্ট আইটেম)
Shut down (শাট ডাউন)
Windows Explorer (উইনডোস এক্সপ্লোরার)
Program Window (প্রোগ্রাম উইনডো)
Minimise (মিনিমাইস)
Maximise (ম্যাক্সিমাইস)

Restore (রেসটোর)
Close (ক্লোস)
Drag (ড্র্যাগ)
Vertical Scroll Bar (ভারটিকাল স্ক্রোল বার)
Horizontal Scroll Bar (হরিজন্টাল স্ক্রোল বার)
Mouse Scroll Button (মাউস স্ক্রোল বাটন)
Hang (হ্যাঙ)
Save (সেভ)
Alt+F4 (অল্ট+এফ-ফোর)
Message (মেসেজ)
Tab Key (ট্যাব বাটন)
Enter Key (এন্টার বাটন)
Ctrl+Alt+Del (সিটিআরএল+অল্ট+ডেল)
Cursor Key (কারসার কীই)
Safe Mode (সেফ মোড)
Restart (রিস্টার্ট)
Screen Saver (স্ক্রিন সেভার)
Install (ইন্স্টল)
Turn off the display (টার্ণ অফ দ্য ডিসপ্লে)
Put the computer to sleep (পুট দ্য কমপিউটার টু স্লীপ)
Sleep Mode (স্লীপ মোড)

পাঠ 2. কমপিউটারের অভ্যন্তরে যাবতীয় তথ্য কীভাবে সঞ্চিত রাখা হয় — ফাইল ও ফোল্ডার

2.1 সঞ্চিত রাখার মাধ্যম বা স্টোরেজ ডিভাইস; হার্ড ডিসক ও হার্ড ডিসক পার্টিশন বা কক্ষ ভাগ

2.2 ফাইল ও ফোল্ডার — উপ বা সাবফোল্ডার; ফোল্ডার লতিকা বা ফোল্ডার ট্রি; ফোল্ডার ট্রিতে কোনও একটি ফোল্ডারে পৌঁছনোর পথ বা পাথ, ও ফাইলের নির্দিষ্ট পথের নাম বা পাথনেম

2.3 কীভাবে একটি ফোল্ডার তৈরি করা যায় — ফোল্ডারের নাম দেওয়া, নাম পাল্টানো, ফোল্ডারটিকেই কমপিউটার থেকে মুছে ফেলা — মাউসের ডান দিকের বাটনটি ক্লিক করা

2.4 প্রোগ্রামের সাহায্যে তৈরি হওয়া ফাইল, ফাইলের ধরন নির্দেশের আইকন; ফাইলের নামের শেষের প্রসারিত অংশ বা এক্সটেনশন; ফাইলের নাম দেওয়া, নাম পাল্টানো, ফাইলটিকেই কমপিউটার থেকে মুছে ফেলা

2.5 কমপিউটারের ফাইল ও ফোল্ডারগুলিকে প্রয়োজন মতো গুছিয়ে রাখা — কপি বা কাট করা ও অন্য কোনও পার্টিশনে, ডিসকে বা ফোল্ডারে পেস্ট করা; টেনে বা ড্র্যাগ করে অন্যত্র রাখা

2.6 কমপিউটারে রাখা কোনও ফাইল বা ফোল্ডারকে খুঁজে বার করা

2.7 কীবোর্ড ব্যবহারের প্রারম্ভিক পরিচয়

অনুশীলন: পাঠ 2-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পাঠ 2. কমপিউটারের অভ্যন্তরে যাবতীয় তথ্য কীভাবে সঞ্চিত রাখা হয় — ফাইল ও ফোল্ডার

2.1 সঞ্চিত রাখার মাধ্যম বা স্টোরেজ ডিভাইস; হার্ড ডিসক ও হার্ড ডিসক পার্টিশন বা কক্ষ ভাগ

আমরা বলেছি যে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নির্দেশকে রাখা যায় কমপিউটারের ভেতরে লাগানো স্টোরেজ ডিভাইস, হার্ড ডিসকে । এছাড়া রিমুভেবল স্টোরেজ ডিভাইস হিসাবে সিডি/ডিভিডি ও পেন ড্রাইভেও রাখা যায়। আমরা এবার দেখব, কীভাবে কমপিউটারের স্টোরেজ ডিভাইসে তথ্য ও নির্দেশকে সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে প্রয়োজন মতো চট করে সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়। কমপিউটারের মধ্যে কীভাবে কোথায় কী তথ্য রাখা আছে তা দেখতে আমরা ডেস্কটপে রাখা **কমপিউটার আইকন**টা ক্লিক করে প্রোগ্রামটি চালু করব।

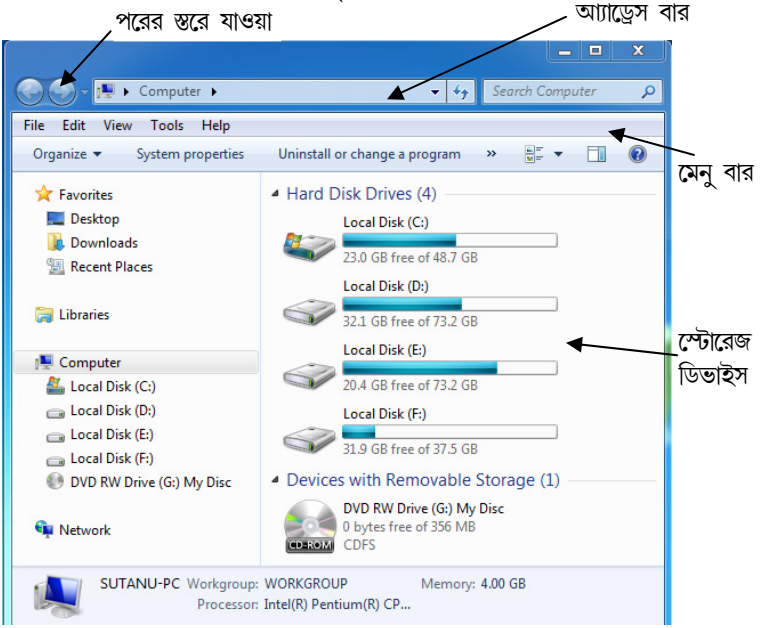

যে প্রোগ্রাম উইনডোটা খুলল, তা এবার ভাল করে দেখে বুঝে নিতে হবে। ছবিতে দেখানো আছে উইনডোটার ওপরের বাঁদিকের কোনায় **তির চিহ্ন**, যাতে ক্লিক করে পরের (বা আগের) উইনডোটাতে ফিরে যাওয়া যায়, **Address Bar** (অ্যাড্রেস বার), **Menu Bar** (মেনু বার), ও স্টোরেজ ডিভাইসগুলো দেখায়। এগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা **Hard Disk Partition** (হার্ড ডিসক পার্টিশন) ব্যাপারটা বুঝে নেব।

হার্ড ডিসক আসলে একটাই (দরকার হলে আরও একটা লাগানো যায়) কিন্তু তাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়েছি (এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে চারটে), ও চিহ্নিত করেছি C:, D:, E:, F: নাম দিয়ে। একে বলে পার্টিশন করা, যেন একটা ঘরের মধ্যেই দেওয়াল তুলে ভাগ করা। এই কাজটা প্রথমেই করে নেওয়া হয় কমপিউটারে সিসটেম সফটওয়্যার ভরা বা **Load** (লোড) করার সময়। আমরা এগুলোকে বলি সি-ড্রাইভ, ডি-ড্রাইভ, ই-ড্রাইভ, এফ-ড্রাইভ, যদিও এগুলো আসলে একটা ডিসকেরই পার্টিশন। এই পার্টিশন করে আমরা কমপিউটারে স্টোর বা জমা করে রাখার জায়গাকে প্রথমেই কয়েকটা ভাগ করে রাখি। **মনে রাখো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল** C: (সি-ড্রাইভ), কারণ এখানে রাখা থাকে সিসটেম সফটওয়্যারটা, যার নির্দেশগুলো অনুযায়ী কমপিউটার চলে। এটা হল **Primary Active** (প্রাইমারি অ্যাক্টিভ) পার্টিশন। তাই উচিত হল এখানে বিশেষ কিছু না করা; **আমাদের অন্যান্য কাজের তথ্যগুলোকে সি-ড্রাইভে না রাখা**। তার জন্য অন্য পার্টিশনগুলো তো অছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, চারটি হার্ড ডিসক ড্রাইভ ছাড়াও এই কমপিউটারটাতে দুটো রিমুভেবল স্টোরেজ ডিভাইস (Removable Storage Device) লাগানো হয়েছে, একটা হল ডিভিডি ড্রাইভ যেখানে একটা **Audio CD** (অডিও সিডি) ঢোকানো আছে, আর অন্যটা হল কিংস্টন নামে একটা পেন ড্রাইভ যেটা ইউএসবি পোর্টে (USB port) ঢোকানো আছে।

2.2 ফাইল ও ফোল্ডার — উপ বা সাবফোল্ডার; ফোল্ডার লতিকা বা ফোল্ডার ট্রি; ফোল্ডার ট্রিতে কোনও একটি ফোল্ডারে পৌঁছনোর পথ বা পাথ, ও ফাইলের নির্দিষ্ট পথের নাম বা পাথনেম

সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে, কমপিউটারে যা কিছুই রাখা হোক, তাকে একটি **File** (ফাইল) হিসাবে নাম, **Filename** (**ফাইলনেম**) দিয়ে রাখতে হবে। চলতি কথায় ফাইল কথাটা আমরা ভুলভাবে ব্যবহার করি, তাই কমপিউটারের ফাইল কথাটার মানে

বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। কাগজপত্রের ফাইল বলতে আমরা যা বলতে চাই তা আসলে ফাইল কভার, যার মধ্যে কাগজপত্র রাখা হয়। কমপিউটারে কোনও লেখা, গান, ছবি, মুভি (সিনেমা), বা কাজ করার প্রোগ্রামের তথ্য ও নির্দেশগুলো, সবই থাকবে এক একটা আলাদা আলাদা ফাইল হিসাবে নির্দিষ্ট নাম দিয়ে। ফাইল কী করে তৈরি করা যায় ও তার নাম কীভাবে দেওয়া যায় তা আমরা পরে শিখব। তার আগে একটা অন্য প্রশ্ন নিয়ে ভাবা যাক।

কমপিউটারে তো অনেক অনেক ফাইল হয়ে যাবে—কোনওগুলো প্রোগ্রামের, কোনওগুলো লেখার, ছবির, গানের, বা মুভির; আর আছে আমরা যেসব কাজ করব সেগুলো। এত ফাইলের মধ্যে তাহলে এক একটা ফাইলকে চট করে খুঁজে পাব কী করে? বাড়ির জিনিসপত্র যেমন এক একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখি, তেমনই কোনও ব্যবস্থা এখানেও লাগবে।

মনে করো এক একটা ফাইল হল এক একটা কাগজ। নানা বিষয়ের এমন অনেক কাগজ দরকারি বলে আমাদের গুছিয়ে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনে চট করে খুঁজে পাই। আমরা তাই কাগজগুলোর বিষয় ভাগ করে নিয়ে এক এক ধরনের বিষয়ের কাগজগুলোকে এক একটা কভারের মধ্যে রেখে দিই আর কভারটার ওপরে বিষয়ের নামটা লিখে রাখি। এগুলোকে আমরা বলি ফাইল কভার। কমপিউটারের ক্ষেত্রে এই ফাইল কভারকেই বলা হয় ফাইল ফোল্ডার বা শুধু **Folder** (ফোল্ডার) আর তার একটা নাম দিতে হয়, যাকে বলে **Folder name** (ফোল্ডার নেম)। সুতরাং, বিষয় ভাগ করে সব ফাইলেকেই কোনও না কোনও বিষয়ের ফোল্ডারে রাখলে আমাদের পক্ষে ফাইল খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। ধরা যাক সব ছবির ফাইলগুলোকে রাখার জন্য আমরা একটা ফোল্ডার করলাম Picture (পিকচার) নাম দিয়ে। কোনও একটি ছবি পেতে তাহলে এই পিকচার ফোল্ডারটাই শুধু খুঁজে দেখব, আর কোথাও দেখতে হবে না।

এবারে লক্ষ করো যে একটা মূল বিষয়ের মধ্যেও বিভিন্ন ভাগ করা যেতে পারে। যেমন ধরো ছবি বা পিকচার। অনেক ছবি হতে পারে কোনও অনুষ্ঠানের, কোনও জায়গায় বেড়ানোর, কোনও আত্মীয়-স্বজনের, কোনও বন্ধু-বান্ধবদের, ইত্যাদি। সবই ছবি, কিন্তু সবগুলোকে একটাই ফোল্ডারে রাখলে এত হয়ে যাবে যে কোনওটাই আর চট করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এখানে পিকচার ফোল্ডারের মধ্যেই আরও ভাগ করতে হবে—অনুষ্ঠান, বেড়ানো, আত্মীয়, বন্ধু, ইত্যাদি নাম দিয়ে। এগুলোকে আমরা বলব পিকচার নামের মূল ফোল্ডারের মধ্যে উপফোল্ডার বা **Subfolder** (সাবফোল্ডার)।

এতেই শেষ নয়। অনুষ্ঠান তো নানা সময়ে নানা কারণে হতেই থাকবে আর তার ছবিও জমা হতে থাকবে। তাহলে গুছিয়ে রাখতে হলে এগুলোকে আবার ভাগ করে রাখতে হবে পরের স্তরের সাবফোল্ডারে। এগুলো হতে পারে অনুষ্ঠান বা উৎসবের নাম দিয়ে বা তারিখ দিয়ে, যেগুলো থাকবে এক একটি অনুষ্ঠান সাবফোল্ডারের মধ্যে। একইভাবে বেড়ানোর জায়গাগুলোর নাম দিয়ে এক একটি সাবফোল্ডার থাকবে বেড়ানো সাবফোল্ডারটার মধ্যে। সুতরাং, একটি ফোল্ডারের মধ্যে যেমন অনেকগুলো ফাইল রাখা যায়, তেমন আরও ফোল্ডার রাখা যায়, ও সেগুলোর মধ্যেও আবার আরও ফোল্ডার রাখা যায়। তাই আমরা প্রত্যেকটি ফোল্ডারকে বলি তার ঠিক আগের স্তরে ফোল্ডারের সাবফোল্ডার। এইগুলোকে সাজিয়ে লিখলে আমরা পাই **Folder tree** (ফোল্ডার ট্রি), যা থাকে কোনও না কোনও স্টোরেজ ড্রাইভে।

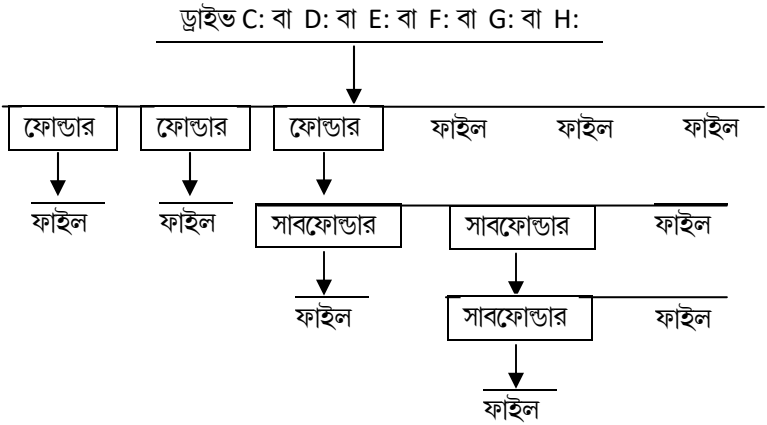

এবারে এই ফোল্ডার ট্রিতে কোনও একটি ফোল্ডারে পৌঁছনোর পথ, যাকে বলা হয় **Path** (পাথ) কী ভাবে লেখা হবে দেখো। শুরু করতে হবে ড্রাইভটির নাম থেকে ও পর পর ফোল্ডার ও তার সাবফোল্ডারগুলো লিখে যেতে হবে নির্দিষ্ট ফোল্ডারটি পর্যন্ত যেমন —E:/Picture/Festival/Dol/2016/। অর্থাৎ, এখানে আমরা দোল উৎসবের যে ছবি তুলেছি সেগুলো রাখার জন্য একটা ফোল্ডার করেছি 2016 নাম দিয়ে, আর এই ফোল্ডারটাকে রেখেছি E: ড্রাইভে পিকচার (Picture) ফোল্ডারের মধ্যে ফেসটিভাল (Festival) ফোল্ডারের ভেতরে দোল (Dol) ফোল্ডারে।

মনে করো 2016-র এই দোল উৎসবে মিতার একটা ছবি আছে, যা একটা ফাইল হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে Mita.jpeg। ফাইলের নাম কেন এরকম তা আমরা পরে বলব। তাহলে এই ফাইলটাতে পৌঁছনোর পথ, যাকে বলা হবে **Pathname** (পাথনেম), হল E:/Picture/Festival/Dol/2016/Mita.jpeg। অর্থাৎ, ফাইলে এসে পথটা শেষ হলে তাকে আমরা পাথনেম বলব। লক্ষ করো এখানে লেখার সময়ে আমরা ড্রাইভ ও ফোল্ডারের পরে \ চিহ্ন দিই যাকে বলা হয় **Backslash** (ব্যাকস্ল্যাশ)। এবার আমরা উইনডোতে একটা ফোল্ডার ট্রি-এর ছবি দেখব।

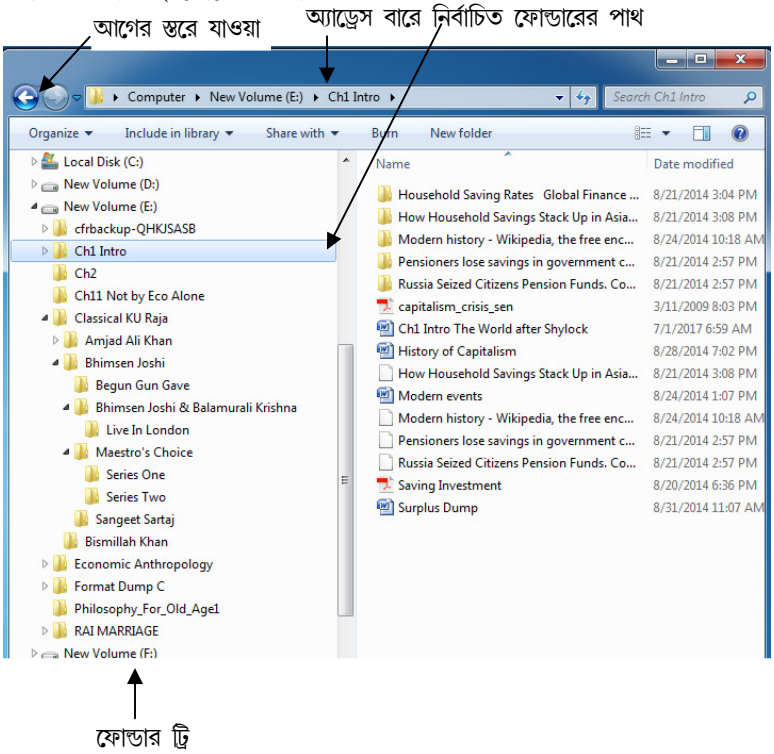

ছবিতে উইনডোর বাঁদিকের অংশে ফোল্ডার ট্রি দেখাচ্ছে। এখানে কোনও ফাইল দেখায় না। ফোল্ডার ট্রির যেকোনও একটি **ফোল্ডারে লেফট ক্লিক** করলেই সেটা সিলেক্ট ও হাইলাইট হয়ে খুলে যায়। তখন তার মধ্যে আরও কী কী ফোল্ডার আর ফাইল আছে

তা ডান দিকের অংশে দেখায়, ও এই **ফোল্ডারের পাথটা দেখায় ওপরের অ্যাড্রেস বারে**। এই উইনডোটার দুটো অংশ মনে রাখো। বাঁদিকেরটা হল কমপিউটরের ড্রাইভ ও তার ফোল্ডার ট্রি দেখানোর উইনডো, আর ডানদিকেরটা হল, বাঁদিকে যে ড্রাইভ বা ফোল্ডার সিলেক্ট করা হয়েছে তার উইনডো। কোনও ফোল্ডারে যেতে বা কোনও ফাইল খুলতে **অ্যাড্রেস বারে সরাসরি টাইপ** করেও পাথ বা পাথনেম লেখা যায়। লক্ষ করো, ওপরের বাঁদিকের কোনায় দুটি বিপরীতমুখি তির চিহ্নে ক্লিক করে আমরা যে পাথে আছি সেই পাথের আগের বা পরের ফোল্ডারে যাওয়া আসা করতে পারি।

বাঁদিকের ফোল্ডার ট্রিকে বিশেষভাবে দেখো। ফোল্ডারগুলোর বাঁ পাশে ফোল্ডার আইকন দেওয়া আছে। যে ফোল্ডারের ভেতরে সাবফোল্ডার আছে তার বাঁদিকে একটা হাল্কা তির চিহ্ন আছে। ওটাতে ক্লিক করলেই ওর ট্রিটা খুলে নিচে দেখায় আর তির চিহ্নটা কালো হয়ে নিচের দিকে মুখ করে। এটা বন্ধ করতে ওই কালো তির চিহ্নতে আবার ক্লিক করতে হবে।

2.3 কীভাবে একটি ফোল্ডার তৈরি করা যায় — ফোল্ডারের নাম দেওয়া, নাম পাল্টানো, ফোল্ডারটিকেই কমপিউটার থেকে মুছে ফেলা— মাউসের ডান দিকের বাটনটি ক্লিক করা

এবারে শেখা যাক কীভাবে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করি। এর জন্য প্রয়োজন হবে মাউসের ডান বাটনটা ক্লিক করা। একে বলে **রাইট ক্লিক** (right click) । মাউস কারসারকে ডেস্কটপের **যেকোনও জায়গায় (কোনও আইকন বা নাম বাদে)** রেখে একবার রাইট ক্লিক করে দেখো স্ক্রিনে একটা লিস্ট আসবে। কীবোর্ডের ডান পাশে একেবারে নিচের লাইনে রাখা একটা বিশেষ বাটন একবার টিপেও এই কাজটা করা যায়। যে লিস্টটা এল, সেটিতে দেখো নতুন বা **New** (নিউ) নামে একটি আইটেম আছে, যার ডান পাশে তির চিহ্ন দেওয়া। কারসারকে সেখানে এনে রাখলেই আরেকটা লিস্ট খুলছে। এই লিস্টের ওপরের দিকেই দেখো একটা আইটেম হল ফোল্ডার। এটাতে ক্লিক করলেই একটা **New Folder** (নতুন ফোল্ডার) তেরি হবে।

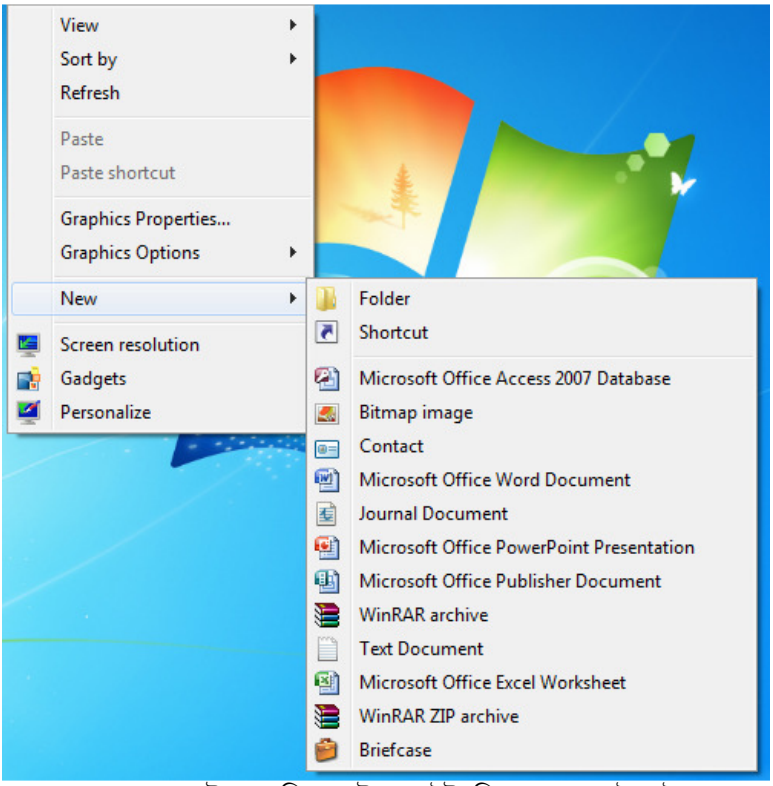

যেহেতু আমরা এটা করেছি ডেস্কটপে রাইট ক্লিক করে, তাই এই নতুন ফোল্ডারটা ডেস্কটপেই তৈরি হবে **নিউ ফোল্ডার** নামে। একই ভাবে আমরা অন্য যে কোনও ফোল্ডারেও সাবফোল্ডার হিসাবে নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে পারব, সেই ফোল্ডার উইনডোটাতে কারসারকে রেখে রাইট ক্লিক করে। লক্ষ করো, কারসারকে কোনও ফোল্ডার বা ফাইলের নামের ওপরে রেখে রাইট ক্লিক করলে কিন্তু অন্য স্ক্রিন আসবে, যাতে ওই ফোল্ডার বা ফাইলটা সম্বন্ধে অন্য কিছু করার লিস্ট দেখাবে।

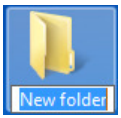

এবারে শিখব এই নতুন ফোল্ডারটির নাম, নিউ ফোল্ডার-এর বদলে অন্য কিছু দেওয়া। এর জন্য ওই নিউ **ফোল্ডার নাম বা নামের আইকনটাতেই** এবার **রাইট ক্লিক**

করতে হবে। এবারে স্ক্রিনে যে লম্বা লিস্টটা আসবে, লক্ষ করো তার নিচের দিকে আছে নতুন নাম দেওয়া বা **Rename** (রিনেম) করার আইটেমটা।

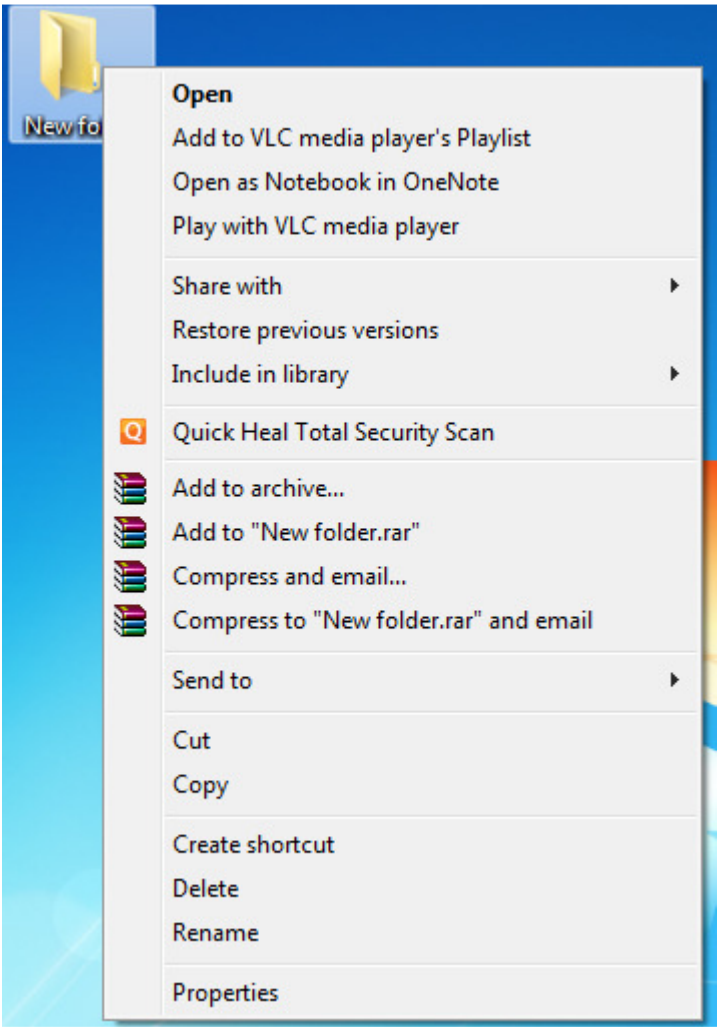

এই লিস্টের রিনেম-এ কারসারকে এনে লেফট ক্লিক করো। দেখা যাবে লিস্টটা স্ক্রিন থেকে চলে গিয়ে এই নতুন ফোল্ডারটার নামের জায়গাটা হাইলাইট হয়ে আছে, যার অর্থ এখন এখানে নতুন নাম টাইপ করা যাবে কীবোর্ড দিয়ে (কীবোর্ডের ব্যবহার করে টাইপ করা আমরা পরে শিখব)। এই রিনেম করাটা পরেও যখন যেমন প্রয়োজন করা যাবে একই ভাবে।

এবার শিখব কী করে কমপিউটার থেকে কোনও অদরকারি ফোল্ডারকে মুছে ফেলা যায়। এমন প্রয়োজন হবেই, কারণ বাড়ির আবর্জনার মতোই কমপিউটারেও ক্রমাগত আজে বাজে ফোল্ডার জমা হতে থাকলে কাজের ফোল্ডারকে অনেকের ভিড়ে খুঁজেই পাওয়া যাবে না, আর কমপিউটারের স্টোরেজ ডিভাইসও ভরে উঠবে। এটা করা যাবে ওই ফোল্ডারটার নাম বা আইকনে একই ভাবে রাইট ক্লিক করে। যে লিস্টটা স্ক্রিনে আসে, তার মধ্যে দেখো রিনেম আইটেমটার ঠিক আগেই আছে **Delete** (**ডিলিট**)। এটাতে লেফট ক্লিক করলে আরেকটা বার্তা বা মেসেজ (Message) আসবে, যেখানে প্রশ্ন থাকবে তুমি কি এই নামের ফোল্ডারটা ডিলিট করতে চাও? এর উত্তরে মেসেজটার Yes (হ্যাঁ) বা No (না) বাটনে ক্লিক করতে হবে। এই বার্তাটা আসে সাবধানতার জন্য, যাতে ভুল করে কোনও কিছু ডিলিট করে না ফেলো। অবশ্য এখন ডিলিট করলেও ফোল্ডারটা চলে যাবে এমনসব ডিলিট করা আবর্জনার ফোল্ডারে, যার নাম **Recycle Bin** (রিসাইকল্ বিন)। সেখান থেকে এটাকে আবার ফেরত আনাও যাবে (restore), যদি পরে তা চাই। কিন্তু রিসাইকল্ বিনকে পরবর্তীকালে খালি করলে বা **Empty** (এম্পটি) করলে আর তা হবে না, একেবারে ডিলিট হয়ে যাবে। রিসাইকল্ বিনের কাজ আমরা পরে জানব।

2.4 প্রোগ্রামের সাহায্যে তৈরি হওয়া ফাইল; ফাইলের ধরন নির্দেশের আইকন; ফাইলের নামের শেষের প্রসারিত অংশ বা এক্সটেনশন; ফাইলের নাম দেওয়া, নাম পাল্টানো, ফাইলটিকেই কমপিউটার থেকে মুছে ফেলা

কমপিউটারে ফাইলগুলোকে গুছিয়ে রাখার জন্য ফোল্ডার তৈরি করাটা আমরা সহজেই শিখে নিয়েছি। এটা আমরা করতে পেরেছি উইনডোস সিসটেমের উইনডোস এক্সপ্লোরার (Windows Explorer) প্রোগ্রামটা দিয়ে, যা চলে ডেস্কটপে রাখা কমপিউটার নামে আইকনে ক্লিক করলে। ফোল্ডার তৈরির মানে স্টোরেজ ডিভাইসটার এক একটি স্থানকে

শুধু নির্দিষ্ট করা ফোল্ডারের নাম দিয়ে, কোনও বিশেষ তথ্য বা নির্দেশ রাখা নয়। ফাইল তৈরি কিন্তু এভাবে হয়না।

বিশেষ বিশেষ ধরনের তথ্য ব্যবহার করে বা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম। তাই তথ্য বা নির্দেশগুলোকে ফাইল হিসাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট ছাঁচ বা **File Format** (ফাইল ফরমাট) অনুসারে Digital (ডিজিটাল) পদ্ধতিতে রাখতে হয়।। তাই বিভিন্ন ধরনের ফাইল হয় ও সেগুলি তৈরি হয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিয়ে, বা প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট ছাঁচে । ফাইল তৈরি করা যাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালিয়ে। এক কথায়, আমরা ফাইল তৈরি করি কোনও না কোনও প্রোগ্রাম চালিয়ে। মূলত কত রকমের ফাইল কমপিউটারে ব্যবহার হতে পারে তা জেনে নিই।

সাধারণ ভাষায় লেখা ও পড়া	বর্ণ - টেক্সট	টেক্সট ফাইল
সংখ্যা ও অঙ্কের ভাষা	বর্ণ -সংখ্যা ও চিহ্ন	ওয়ার্কশীট ফাইল
মিউজিক বা গান তৈরি ও শোনা	শব্দ	সাউন্ড ফাইল
ছবি তৈরি ও দেখা	দৃশ্য	পিকচার ফাইল
মুভি বা সিনেমা	শব্দ ও দৃশ্য	মুভি ফাইল
কমপিউটারে থেকে কমপিউটারে এগুলোর আদান-প্রদান		ইন্টারনেট ফাইল
কমপিউটারকে কোনও বিশেষ কাজ করার নির্দেশ		প্রোগ্রাম ফাইল
কমপিউটার চালানোর নিজস্ব ফাইল		সিসটেম ফাইল
কমপিউটারের ভাষা		ল্যাঙ্গয়েজ ফাইল

স্বভাবতই এইসব ধরনের ফাইলগুলোকে আলাদা করে নির্দিষ্ট করা দরকার। তার ওপর এক একটি ধরনের কাজের জন্য আছে বহু প্রোগ্রাম, যেগুলি আবার একটা আরেকটার থেকে আলাদা। একটা প্রোগ্রামের ফাইল সাধারণত অন্য প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যায় না। তাই ফাইলটা কোন্ ধরনের ও কোন্ প্রোগ্রামের সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য ফাইলের নামের শেষে একটি ডট বা ফুলস্টপ (.) দিয়ে কয়েকটি বিশেষ অক্ষর লেখা থাকে। একে বলা হয় **Filename Extension** (ফাইলনেম এক্সটেন্শন)। আমরা আগে একটা ফাইলের নাম লিখেছিলাম, Mita.jpeg। এখানে Mita হল ফাইলের নাম আর .jpeg হল এক্সটেন্শন। এই এক্সটেন্শনটা এক বিশেষ ধরনের ছবি বা পিকচার বোঝায়। ফাইল এক্সটেন্শনের কয়েকটা উদাহরণ হল, .txt, .doc, .docx, xls, xlsx, mdb, ppt, pptx, pdf, mp3, jpeg, bmp, gif, mp4, html, exe, com, sys, dll, ini, bat, ইত্যাদি। আজকাল উইনডোস এটা সবসময় দেখায় না, বদলে চট করে দেখে বোঝার জন্য যে প্রোগ্রামের ফাইল, সেই প্রোগ্রামের

আইকন অথবা যে ধরনের ফাইল তার একটা আইকন ফাইলের নামের আগে বসিয়ে দেখায় **File icon** (ফাইল আইকন) হিসাবে। যেসব ফাইলের নামের আগে তার প্রোগ্রাম আইকনটা দেখানো থাকে সেগুলো **ডাবল ক্লিক্ করলেই চালু হয়ে যায়** ।

এবার দেখা যাক ফাইলের নাম দেওয়া, নাম পাল্টানো (রিনেম), ও ফাইলকে কমপিউটার থেকে মুছে ফেলা (ডিলিট)। ফাইলের নাম দিতে হয় যখন কোনও প্রোগ্রামে কাজ করে কাজটাকে সঞ্চয় বা জমা করে রাখতে হয় (সেভ করা)। প্রোগ্রামটিতেই এই ব্যবস্থা থাকে। প্রোগ্রামটাই বলবে সেভ করার সময় কাজটাকে একটা ফাইল হিসাবে নাম দিতে। ফাইলটা কোথায় বা কোন কোন্ ফোল্ডারে সেভ করা হবে তাও বলে দেওয়া যায়। ফাইলের রিনেম ও ডিলিট একই ভাবে করা যাবে, যেমনটা আমরা ফোল্ডারের ক্ষেত্রে শিখেছি, মাউসে রাইট ক্লিক করে। মনে রাখতে হবে, **সি-ড্রাইভের প্রোগ্রাম ফাইলগুলো যেন ভুলেও রিনেম বা ডিলিট না করি। তাহলে প্রোগ্রাম, এমনকী কমপিউটারটাই অচল হয়ে যাবে।**

2.5 কমপিউটারের ফাইল ও ফোল্ডারগুলিকে প্রয়োজন মতো গুছিয়ে রাখা — কপি বা কাট করা ও অন্য কোনও পার্টিশনে, ডিসকে বা ফোল্ডারে পেস্ট করা; টেনে বা ড্র্যাগ করে অন্যত্র রাখা

মাঝে মাঝেই দরকার হবে কমপিউটারে ফাইল ও ফোল্ডারগুলোকে গুছিয়ে রাখার জন্য কোনও একটা ড্রাইভ বা ফোল্ডার থেকে অন্য কোনও ড্রাইভ বা ফোল্ডারে নিয়ে যাওয়া। তাছাড়া ফাইল ও ফোল্ডারকে সিডি/ডিভিডি বা পেন ড্রাইভ থেকে হার্ড ডিসকে, অথবা হার্ড ডিসক থেকে সিডি/ডিভিডি বা পেন ড্রাইভে নিয়ে রাখাও দরকার হবে। এই কাজটা করা যাবে দুটো ধাপে— প্রথমে করতে হবে **Copy** (কপি) অথবা **Cut** (কাট) ও তারপরে করতে হবে **Paste** (পেস্ট) ।

1. প্রথমে কপি বা কাট করা — **যে ফাইল বা ফোল্ডারকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে** তার নামের ওপরে কারসারকে রাইট ক্লিক করতে হবে। সেই লিসটটা খুলবে, যেটা আমরা আগে দেখেছি রিনেম বা ডিলিট করতে। ওই লিসটেই দেখো, একটা আছে কপি ও আর একটা আছে কাট নামের আইটেম। কপি করতে হলে কপি আইটেমটাতে আর কাট করতে হলে কাট আইটেমটাতে কারসারকে নিয়ে গিয়ে লেফট ক্লিক করতে হবে। কপি ও কাট করার মানে আর তাদের তফাত কী, তা আমরা পরে বলছি।

2. এরপর পেস্ট করা — **যে ড্রাইভ বা ফোল্ডারে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে**, সেই ড্রাইভ বা ফোল্ডার উইনডোটা খুলতে হবে ও সেই উইনডোর ফাঁকা জায়গায় (কোনও ফোল্ডার বা ফাইলনেম বা তার আইকনের ওপরে নয়) মাউস কারসারকে নিয়ে গিয়ে আবার রাইট ক্লিক করতে হবে। এবারে যে লিসটটা খুলবে তার মধ্যে দেখো পেস্ট আইটেমটা আছে। এটাতে লেফট ক্লিক করলেই যে ফাইল বা ফোল্ডার কপি করা হয়েছিল, তা এখানে চলে আসবে।

এবারে কপি ও কাটের তফাতটা লক্ষ করব। যখন আমরা কোনও ফাইল বা ফোল্ডার যেখানে আছে তাকে সেখানেই রেখে শুধু চাই তার একটা কপি নিয়ে অন্য জায়গাতেও রাখতে, তখন আমরা কপি ব্যবহার করব। কিন্তু যদি আমরা তাকে সেখান থেকেই সরিয়ে বা **Move** (মুভ) করে অন্য জায়গাতে রাখতে চাই, তাহলে কাট ব্যবহার করব। অর্থাৎ, **কাট-পেস্ট** করলে সেটা আগের জায়গা থেকে মুছে যাবে, থাকবে শুধু নতুন জায়গাতে। আর, **কপি-পেস্ট** করলে আগের জায়গা ও নতুন জায়গা, দুই জায়গাতেই থাকবে।

কোনও ফোল্ডার বা ফাইলকে কাট-পেস্ট করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া বা মুভ করার আর একটা উপায় হল ফোল্ডার বা ফাইলে মাউসের লেফট বাটন চেপে রেখে টেনে নিয়ে যাওয়া বা ড্র্যাগ (drag) করে অন্য জায়গাটাতে নিয়ে লেফট বাটনটা ছেড়ে দেওয়া। লক্ষ করো, কোনও ফাইল বা ফোল্ডারকে ড্র্যাগ করে ডেস্কটপে নিয়ে গেলে কিন্তু কপি-পেস্ট হবে, কাট-পেস্ট বা মুভ হবে না।

মনে রেখো, অযথা এখানে ওখানে ফাইল ও ফোল্ডারকে একাধিক কপি করে রাখলে কিন্তু ভিড় বাড়ে আর শেষ কাজ কোনটাতে করা হয়েছিল তা খুঁজে পাওয়া সমস্যা হয়। কোনও কারণে নষ্ট হয়ে গেলেও যাতে আবার পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা যায় **Backup** (ব্যাক-আপ) করে, যা পরে বলা হবে। আর একটা বিষয় হলো ডেস্কটপে অতিরিক্ত ফাইল বা ফোল্ডার জমিয়ে ফেলা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোনও ফাইলে (বা ফোল্ডারে) বারে বারে কাজ করা হয় বলে সেটাকে অনেকেই ডেস্কটপে রাখে চট করে খোলার সুবিধার জন্য। এটা ঠিক নয়। কোনও কারণে কমপিউটার কাজ না করলে নতুন করে সিসটেম সফটওয়্যার লোড করতে হয়, আর তখন এইসব ফাইল ও ফোল্ডারগুলো আর থাকে না। তাই কাজ করার ফাইল ও ফোল্ডারকে রাখতে হবে অন্য কোনও ড্রাইভে, সি-ড্রাইভ বা ডেস্কটপ নয়। চট করে খোলার সুবিধার জন্য তার একটি **Shortcut Icon** (শর্টকাট আইকন) ডেস্কটপে রাখা যেতে পারে। ফাইল বা

ফোল্ডারটার নামে রাইট ক্লিক করলে যে লিসটটা আসে তাতে আছে **Send to** (সেন্ড টু) যার মধ্যে আবার আছে **Desktop (Create shortcut)** (ডেস্কটপ (ক্রিয়েট শর্টকাট)) । এটা করলে ডেস্কটপে ফাইল বা ফোল্ডারটার শর্টকাট আইকন তৈরি হবে, কিন্তু ফাইল বা ফোল্ডারটা থাকবে আসলে অন্যত্র।

অনেকগুলো ফাইল ও ফোল্ডারকে কপি-পেস্ট বা কাট-পেস্ট আমরা একসাথেও করতে পারি, একটা একটা করে বারে বারে না করে। এর জন্য কপি বা কাট করার ফাইল বা ফোল্ডারগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে নিতে হবে। নানাভাবে আমরা একসাথে অনেকগুলো ফাইল বা ফোল্ডারকে সিলেক্ট করতে পারি।

একাধিক ফাইল বা ফোল্ডার সিলেক্ট করা

মাউসের লেফট বাটনকে চেপে রেখে এটা করা যায়, যদি যেগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে সেই ফাইল বা ফোল্ডারগুলো পরপর থাকে। কিন্তু এটা করতে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা সহজ রাস্তাটাই এখন শিখব। এর জন্য কীবোর্ডের দুটো বাটনকে চিনে নিতে হবে, Shift (শিফট) আর কনট্রোল বা সিটিআরএল (Ctrl)। কীবোর্ডের মূল অক্ষর-অংশটার দুই দিকেই নিচের লাইনে থাকে সিটিআরএল আর তার ওপরেই থাকে শিফট বাটন, মোট দুটো করে।

যেগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে সেই ফাইল বা ফোল্ডারগুলো যদি পরপর থাকে, তাহলে আমরা মাউস কারসারকে ফাইল বা ফোল্ডারের ওপরের প্রথমটাতে (বা নিচের শেষেরটাতে) এনে লেফট ক্লিক করে সিলেক্ট করব (এটা হাইলাইট হয়ে যাবে)। এবার কীবোর্ডের Shift (শিফট) চেপে রেখে নিচের শেষ (বা ওপরের প্রথম) ফাইল বা ফোল্ডারে মাউস কারসার এনে লেফট ক্লিক করব। দেখো যে পরপর সবগুলোই সিলেক্ট (হাইলাইট) হয়ে যাবে। এবারে এই সিলেক্ট করা জায়গাতে রাইট ক্লিক করে সবগুলোকেই কপি বা কাট করা যাবে একসাথে। সিলেক্ট করাটা ভুল হয়ে গেলে অন্য যে কোনও জায়গায় আবার লেফট ক্লিক করলেই এই সিলেক্ট করাটা চলে যাবে।

যেগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে সেই ফাইল বা ফোল্ডারগুলো যদি পরপর না থাকে, তাহলে আমরা Ctrl (সিটিআরএল) চেপে রেখে একটা একটা করে ফাইল বা ফোল্ডারে লেফট ক্লিক করব ও তারপর সিলেক্ট করা যে কোনও একটার ওপরে রাইট ক্লিক করব। সবগুলোকেই কপি বা কাট করা যাবে একসাথে। মনে রাখতে হবে, এক একটা কপি বা কাট করার নির্দেশ কমপিউটার সাময়িকভাবে তার স্মৃতি বা **Memory** (মেমরি)-তে রাখে, যতক্ষণ না আবার কোনও কিছু কপি বা কাট করা হচ্ছে।

2.6 কমপিউটারে রাখা কোনও ফাইলকে খুঁজে বার করা

ফাইল ও ফোল্ডারগুলোকে কোনও একটা নিয়মে গুছিয়ে রাখলেও এটা হতেই পারে যে বহুদিন ব্যবহার হয়নি এমন কোনও একটা কাজের ফাইল কোথায় যে আছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কমপিউটারের হার্ড ডিসকে হয়ত আছে চার-পাঁচটা পার্টিশন, তার এক একটাতে আছে নানা ফোল্ডার আর এক একটা ফোল্ডারে হয়ত আছে প্রায় অসংখ্য ফাইল। এর মধ্যে থেকে আমাদের দরকারি ফাইলটাকে তাহলে খুঁজে পাব কী করে?

আমরা জানি যে ডেস্কটপে রাখা **কমপিউটার আইকন**টা ক্লিক করে **উইনডোস এক্সপ্লোরার** প্রোগ্রামটা চালিয়ে আমরা দেখতে পাই কমপিউটারের স্টোরেজ ডিভাইসগুলোর (হার্ড ডিসক, সিডি/ডিভিডি, পেন ড্রাইভ) কোথায় কী কী ফোল্ডার রাখা আছে আর সেগুলোর মধ্যে আরও কী কী ফোল্ডার ও ফাইল আছে। মনে করো তোমার একটা আন্দাজ আছে, কোন্ ড্রাইভের কোন্ ফোল্ডারে ফাইলটা থাকতে পারে। এখন সেই ফোল্ডারটা খুলে দেখলে যে তাতে অজস্র ফাইল। এবার কী করবে? একটা একটা করে ফাইল খুলবে আর বন্ধ করবে, যতক্ষণ না ওটা খুঁজে পাচ্ছ? এটা তো অনেক লম্বা ব্যাপার হয়ে যাবে, আর শেষমেশ হয়তো দেখবে এই ফোল্ডারে ওই ফাইলটা আদৌ নেই। তাহলে উপায়?

ডেস্কটপের কমপিউটার আইকনটা ক্লিক করে উইনডোস এক্সপ্লোরার প্রোগ্রামটা চালালে যে উইনডোটা স্ক্রিনে আসে তার মেনু বারের নিচে ডানদিকে দেখো। ওখানে **More options** (মোর অপ্শনস) নামে একটা লিস্ট বাটন আর তার পাশে আছে **Show/Hide preview pane** (শো/হাইড প্রিভিউ পেন)। মোর অপ্শনস বাটনটাতে ক্লিক করে দেখো একটা লিস্ট আসে। এটাতে আছে উইনডোটার ডান অংশে ফাইলগুলোকে ছোট-বড় করে নানাভাবে দেখানোর উপায়। এটা নিজে করে দেখে নাও। শো/হাইড প্রিভিউ পেন বাটনটা হল টগ্‌ল বাটন, মানে একবার ক্লিক করলে ডান দিকের অংশে প্রিভিউ পেনটা শো (দেখানো) হয় আর পরের বার ক্লিক করলে সেটা হাইড (লুকানো) থাকে ।

ফাইল প্রিভিউয়ের অর্থ হল ফাইলটা না খুলেও ফাইলটাতে কী আছে তা দেখতে পাওয়া। প্রিভিউ পেনটা শো করে নাও। দেখবে এক একটা ফাইল না খুলেও একবার ক্লিক করে সিলেক্ট করলেই পাশের প্রিভিউ পেনে দেখা যাচ্ছে ফাইলটাতে কী আছে। সুতরাং, প্রিভিউ পেনটা শো করে আমরা দেখতে পাব এক একটা ফাইলে কী আছে। এটা তাই আমাদের সাহায্য করবে ফাইল খুঁজে পেতে।

এমনটাও হতে পারে যে আদৌ ফাইলটা এই কমপিউটারে আছে কিনা বা থাকলেও কোন্ ড্রাইভের কোন্ ফোল্ডারে আছে, তা জানা নেই। এই ক্ষেত্রে ফাইলটাকে খুঁজতে হবে অন্যভাবে। স্টার্ট আইকনে ক্লিক করে স্টার্ট মেনু লিস্টটা খোলো। লিস্টটার একদম নিচে দেখো একটা লম্বা বাক্স মতো জায়গায় আবছা করে লেখা আছে *Search* (**সার্চ**) *program or files* প্রোগ্রাম বা ফাইল। এই জায়গাটাতে ক্লিক করে নিয়ে ফাইলটার নাম একটা একটা অক্ষর বা বর্ণ লিখতে শুরু করো ও যে লিস্টটা আসবে সেটা দেখো। ফাইলটা কমপিউটারের কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেবে। এখানেই ক্লিক করে তুমি ফাইলটাকে চালিয়ে দেখে নিতে পারো। **সার্চ করা আমরা উইনডোস এক্সপ্লোরার** প্রোগ্রামটা চালিয়েও করতে পারি। লক্ষ করো যে এটার উইনডোতেও ওপরে ডানদিকে সার্চ কমপিউটার নামে একটা জায়গা রাখা আছে, যেখানে ফাইলটার নাম লিখে সার্চ করা যায়।

ফাইল বা ফোল্ডারকে Read only (রীড ওন্‌লি) ও Hidden (হিডেন) করা

এটা আমরা পরে শিখব, আপাতত জেনে রাখলেই চলবে। কোনও ফাইল বা ফোল্ডারকে রাইট ক্লিক করলে যে লিস্টটা আসে তার শেষে থাকে **Property** (প্রপার্টি)। এটা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাই ওই ফাইল বা ফোল্ডারটা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়, যেখানে থাকে **Attribute** (**অ্যাট্রিবিউট**) বা ফাইল বা ফোল্ডারটার গুণাগুণ। আমাদের কাজের ফাইল ও ফোল্ডারগুলো তৈরি হয় **Archive** (আর্কাইভ) হিসাবে, যা আমরা সর্বদা দেখতে পাই ও ক্রমাগত কাজ করে পাল্টাতেও পারি। এই অ্যাট্রিবিউটটা আমরা পাল্টে রীড ওন্‌লি অথবা হিডেন করে দিতে পারি, এই দুটির পাশের **Check Box** (**চেক বক্স**) ক্লিক করে টিক চিহ্ন দিয়ে। রীড ওন্‌লি করা হলে ফাইল বা ফোল্ডারটা দেখা যাবে, কোনও রকম পাল্টানো যাবে না। হিডেন করলে ফাইল বা ফোল্ডারটা থাকবে বটে কিন্তু দেখা যাবে না। ওই চেক বক্সগুলোতে আবার ক্লিক করে টিক চিহ্নটা তুলে দিলে আর রীড ওন্‌লি বা হিডেন থাকবে না। প্রশ্ন হল, কোনও ড্রাইভ বা ফোল্ডারের মধ্যে হিডেন ফাইল বা ফোল্ডার থাকলে তা আমরা দেখব কী করে। উইনডোস এক্সপ্লোরার প্রোগ্রাম উইনডোর মেনু বারে আছে টুল্‌স। এটা ক্লিক করলে পাওয়া যাবে ফোল্ডার অপ্‌শনস। তার মধ্যে ভিউ বাটনটা ক্লিক করলে একটা লিস্টে নানা অপ্‌শন আর প্রত্যেকটার সামনে চেক বক্স দেখাবে। শো হিডেন ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডারের চেক বক্সটা ক্লিক করে টিক্ দিয়ে দিলে ওই ফোল্ডারটার মধ্যে রাখা সব হিডেন ফাইল বা ফোল্ডারগুলোও দেখা যাবে।

2.7 কীবোর্ড ব্যবহারের প্রারম্ভিক পরিচয়

আমরা কীবোর্ডের কয়েকটি কীই বা বাটন, যেমন কারসার কীই, Enter, Alt, F4, Ctrl, Del, Tab, Shift, ইত্যাদি আগেই উল্লেখ করেছি। এবারে পুরো কীবোর্ডটা আমরা ভাল করে দেখে নেব। দেখে রাখো, কমপিউটার চালু করার সময়েই কীবোর্ডের ডানদিকের ওপরে আলো জ্বলবে।

কীবোর্ডের ছবিতে দেখো, একটু-আধটু অন্যরকম দেখতে, বা কয়েকটা বাড়তি কীই দেওয়া ছাড়া কীবোর্ডের কীইগুলোর মূল সাজানোটা একই। বাঁদিকে মূল অংশ, যেখানে ইংরেজি অক্ষরগুলো **QWERTY** ছাঁচে ও ওপরে 1,2,3,4,5…সংখ্যাগুলো আছে এক একটা কীইতে। ডান পাশে আবার সংখ্যাগুলো দেওয়া কীইগুলো আছে, সংখ্যা টাইপ করার সুবিধার জন্য। এই অংশটাকে বলে **Number Pad** (নাম্বার প্যাড)।

অক্ষর ও বিশেষ অক্ষরচিহ্ন লেখা কীইগুলো ও ওপরের লাইনে সংখ্যা লেখা কীইগুলো ব্যবহার হয় অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন ও সংখ্যা টাইপ করে লেখার জন্য। এগুলোর প্রত্যেকটা দিয়ে আবার দুটো করে লেখা টাইপ হয়। একটা হয় সাধারণভাবে, আরেকটা হয় **Shift** (শিফট কীই) চেপে রেখে টাইপ করলে—যেমন, ইংরেজি ছোট

হাতের অক্ষর বা **Small Letter** (স্মল লেটার) টাইপ হবে সাধারণভাবেই, আর শিফট চেপে রেখে টাইপ করলে পাব বড় হাতের অক্ষর বা **Capital Letter** (ক্যাপিটাল লেটার)। ওপরের সংখ্যা লেখা কীইগুলো শিফট চেপে রেখে টাইপ করলে পাব বিশেষ অক্ষর ও চিহ্ন।

একনাগাড়ে বড় হাতের বা ক্যাপিটাল অক্ষর টাইপ করার সুবিধার জন্য বাঁ পাশে শিফট কীইয়ের ঠিক ওপরে আছে **Caps Lock (ক্যাপস্ লক্)** বাটন। ওটা একবার টিপলেই শিফট বাটনটা চাপাই থেকে যায় আর সব অক্ষর বড় হাতের টাইপ হয়। এই লক্ করা হলে কীবোর্ডের ডানদিকের ওপরে ক্যাপস্ লক্ আলোটা জ্বলে থাকে। লক্ ছাড়াতে ক্যাপস্ লক বাটনটা আবার একবার টিপতে হয়। এই ধরনের বাটন, যা একবার টিপলে **On** (অন) আর পরের বার টিপলে **Off** (অফ) হয় তাকে **Toggle Switch** (টগল্ সুইচ) বলে। মনে রেখো, ক্যাপস্ লক কিন্তু ওপরের সংখ্যা লেখা কীইগুলোতে হয় না।

এই মূল অংশের একদম ওপরের লাইনে বাঁদিকে দেখো আছে **এসকেপ বা Esc** (ইএসসি কীই) ও তার পাশে পর পর আছে F1, F2, ….F12 লেখা কীইগুলো। F-লেখা কীইগুলোকে বলে **Function Key** (ফাংশন কীই) যা বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন কাজ করার জন্য রাখা থাকে। এগুলো এখনই আমরা বিশেষ ব্যবহার করব না। Esc কীইটা ব্যবহার করতে হয় কোনও একটা অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য। করে দেখো — ডেস্কটপের কোথাও রাইট ক্লিক করলে একটা লিসট আসবে স্ক্রিনে, আর Esc টিপলে ওই স্ক্রিনটা চলে যাবে।

মূল অংশের বাঁ ধারে দেখো পরপর আছে Tab, Caps, Shift, ও Ctrl। তলার লাইনে Ctrl -এর পাশেই **Windows Menu Key** (উইনডোস মেনু কীই) আছে। এটা টিপলে স্টার্ট মেনু আসবে, আর সেটা বন্ধ করতে Esc টিপতে হবে। তার পাশে **Alt Key** (অল্ট কীই) ও তারপর লম্বা একটা কীই, যাকে বলা হয় **Space Bar** (স্পেস বার)। এটা লাগে কোনও কিছু টাইপ করে লেখার সময় দুটো লেখার মাঝে ফাক বা স্পেস রাখতে। তার পাশে আবার আছে Alt, **উইনডোস আইকন**, Ctrl কীই, ও সেইসঙ্গে **List Key** (লিস্ট কীই) , যা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুলোর পরেই আছে আবার একটা শিফট কীই। অর্থাৎ, যে কয়েকটি কীই খুবই বেশি ব্যবহার হয় সেগুলোকে দুটো করে দুইপাশে দেওয়া থাকে কাজের সুবিধার জন্য।

মূল অংশের ডান ধারে শিফট কীইয়ের ওপরে আছে **Enter Key** (এন্টার কীই)। এটাও আরো একটা দেওয়া আছে দেখো নাম্বার প্যাডের একদম ডানদিকের নিচে। এই

কীইয়ের কাজ হল কোনও নির্দেশকে কমপিউটারে ঢোকানো বা সক্রিয় করা। করে দেখো, কোনও একটি ফাইল বা ফোল্ডারকে সিলেক্ট করে Enter টিপলেই সেটা খুলে যায়। এন্টার কীইয়ের ডান পাশেই নিচের দিকে রাখা আছে ওপরে, নিচে, ডাউনে ও বাঁয়ে তির চিহ্ন দেওয়া **Cursor Key** (কারসার কীই) গুলো। অভ্যেস করো ডেস্কটপ স্ক্রিনে বা কোনও একটা ফোল্ডারের উইনডো খুলে Tab আর কারসার কীই টিপে টিপে দেখো পর পর কীভাবে কোথায় হাইলাইট হচ্ছে।

এন্টার কীইয়ের ওপরেই ← চিহ্ন দেওয়া একটা কীই আছে, যাকে বলে **Backspace** (ব্যাকস্পেস) কীই। এটার ব্যবহার হয় টাইপ করে লেখার সময়। কোনও কিছু লেখা বা স্পেস দেওয়া থাকলে, ব্যাকস্পেস টিপে লেখার কারসারটার বাঁদিকে একটা একটা করে লেখা অক্ষর বা স্পেস কাটা যাবে। আমরা দেখব **Delete Key** (ডিলিট কীই) একই ধরনের কাজ করে, কিন্তু কাটে ডানদিকেরগুলো। Ctrl চেপে রেখে ব্যাকস্পেস বা ডিলিট টিপলে এক একটা অক্ষরের বদলে পুরো শব্দ কাটা যায় পর পর, বাঁদিকে বা ডানদিকে।

কীবোর্ডের বাঁ দিকের মূল টাইপ করার অংশ ও ডানদিকের নাম্বার প্যাডের মাঝে কারসার কীইগুলোর ওপরে আরও ছটা কীই আছে। এগুলো হল, **Insert** (ইনসার্ট), **Delete** (**ডিলিট**), **Home** (হোম), **End** (এন্ড), **Page Up** (পেজ আপ) ও **Page Down** (পেজ ডাউন)। তারও ওপরে আছে **Prt Scr Sys Rq, Scroll Lock, Insert, Pause Break**, যেগুলোর কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ কাজে ব্যবহার হয় ।

ইনসার্ট কীইয়ের ব্যবহার কোনও কোনও লেখার প্রোগ্রামে রাখা থাকে দুটো অক্ষরের মধ্যে আরও কিছু অক্ষর টাইপ করার জন্য। এটা টগল্ কীই হিসাবে কাজ করে। ডিলিট কীইয়ের ব্যবহার আগে বলা হয়েছে। হোম, এন্ড, পেজ আপ, ও পেজ ডাউন কীইয়ের ব্যবহার লক্ষ করে নাও কোনও একটা ফোল্ডার উইনডো খুলে এগুলোকে টিপে টিপে।

এবারে কীবোর্ডের ডানপাশের নাম্বার প্যাডটা। ওপরের প্রথম কীইটা হল **Num Lock** (নাম লক)। এটা টগল্ কীই, যা দিয়ে নাম্বার প্যাড অন ও অফ হয়। কমপিউটার চালু হয় নাম্বার লক অন অবস্থায়। তাই ওপরে নাম্বার লক অন বোঝাতে একটা আলো জ্বলে থাকে। নাম্বার লক টিপলে এটা অফ হয়ে যায়। তখন কীইগুলো দিয়ে নাম্বার টাইপ হয় না। ওগুলো তখন কাজ করবে কারসার কীই হিসাবে, আর ইনসার্ট, ডিলিট ইত্যাদি করতে। এছাড়া নাম্বার প্যাডে রাখা আছে ভাগ, গুণ, বিয়োগ, যোগ চিহ্নগুলো, ও আর একটা এন্টার কীই।

অনুশীলন: পাঠ 2-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পর পর যেভাবে শেখা হয়েছে, শব্দগুলো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো পর পর পড়ে মনে করো, পাঠে কী বলা হয়েছে। মনে ঠিক না এলে আবার পাঠের ওই জায়গাটা দেখে নাও।

Address Bar (অ্যাড্রেস বার)
Hard Disk Partition (হার্ড ডিসক পার্টিশন)
Audio CD (অডিও সিডি)
Filename (ফাইলনেম)
Folder name (ফোল্ডার নেম)
Folder tree (ফোল্ডার ট্রি)
Pathname (পাথনেম)
New Folder (নতুন ফোল্ডার)
Delete (ডিলিট)
Empty (এম্পটি)
Filename Extension (ফাইলনেম এক্সটেন্শন)
Copy (কপি)
Paste (পেস্ট)
Backup (ব্যাক-আপ)
Send to (সেন্ড টু)

Memory (মেমরি)
Show/Hide preview pane (শো/হাইড প্রিভিউ পেন)
Read only (রীড ওন্লি)
Property (প্রপার্টি)
Archive (আর্কাইভ)
QWERTY
Shift (শিফট কীই)
Capital Letter (ক্যাপিটাল লেটার)
On (অন)
Toggle Switch (টগল্ সুইচ)

Menu Bar (মেনু বার)
Load (লোড)
File (ফাইল)
Folder (ফোল্ডার)
Subfolder (সাবফোল্ডার)
Path (পাথ)
Backslash (ব্যাকস্ল্যাশ)
Rename (রিনেম)
Recycle Bin (রিসাইকল্ বিন)
File Format (ফাইল ফরমাট)
File icon (ফাইল আইকন)

Cut (কাট)
Move (মুভ)
Shortcut Icon (শর্টকাট আইকন)
Desktop (Create shortcut) (ডেস্কটপ (ক্রিয়েট শর্টকাট))
More options (মোর অপ্শনস)
Search program or files (সার্চ)

Hidden (হিডেন)
Attribute (অ্যাট্রিবিউট)
Check Box (চেক বক্স)
Number Pad (নাম্বার প্যাড)
Small Letter (স্মল লেটার)
Caps Lock (ক্যাপস্ লক)
Off (অফ)
Esc (ইএসসি কীই)

Function Key (ফাংশন কীই)

Alt Key (অল্ট কীই)
List Key (লিস্ট কীই)
Cursor Key (কারসার কীই)
Delete Key (ডিলিট কীই)
Delete (ডিলিট)
End (এন্ড)
Page Down (পেজ ডাউন)
Scroll Lock
Num Lock (নাম লক)
Windows Menu Key (উইনডোস মেনু কীই)
Space Bar (স্পেস বার)
Enter Key (এন্টার কীই)
Backspace (ব্যাকস্পেস)
Insert (ইনসার্ট)
Home (হোম)
Page Up (পেজ আপ)
Prt Scr Sys Rq
Pause Break

পাঠ 3. প্রোগ্রামের সাহায্যে নতুন ফাইল তৈরি ও সেভ করা শেখা— পেইন্ট প্রোগ্রামটির ব্যবহার

3.1 প্রোগ্রামটা চালু করা ও প্রোগ্রাম উইনডো

3.2 প্রোগ্রামের মেনু লিস্ট

3.3 প্রোগ্রামের মেনু ট্যাব, রিবন গ্রুপ ও পেইন্ট প্রোগ্রামটি ব্যবহার

অনুশীলন: পাঠ 3-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পাঠ 3 প্রোগ্রামের সাহায্যে নতুন ফাইল তৈরি ও সেভ করা শেখা—পেইন্ট প্রোগ্রামটির ব্যবহার

আমরা আগেই বলেছি যে কমপিউটারে কোনও লেখা, গান, ছবি, মুভি (সিনেমা), বা নির্দেশগুলো, সবই থাকবে তথ্য হিসাবে এক একটা আলাদা আলাদা ফাইলে নির্দিষ্ট নাম দিয়ে । তাই কমপিউটারে যে কোনও তথ্যকে রেখে দিতে হলে তাকে একটা ফাইল হিসাবে নাম দিয়ে সেভ করতে হয়। এই তথ্যগুলো ব্যবহার করা হবে যে প্রোগ্রামটা দিয়ে সেই প্রোগ্রাম দিয়েই তথ্যগুলোকে ফাইল হিসাবে সেভ করতে হয় । কমপিউটারের ফাইলগুলো তাই তৈরি হয় এক একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দিয়ে। **Paint** (পেইন্ট) একটা প্রোগ্রাম যা দিয়ে ছবি আঁকা যায় ও ওই ছবিকে একটা ফাইল হিসাবে নাম দিয়ে সেভ করে রাখা যায় । আমরা এবার শিখব কী করে প্রোগ্রামটা চালিয়ে আমরা ছবি আঁকতে পারি ও ছবিটাকে একটা ফাইল হিসাবে নাম দিয়ে সেভ করতে পারি ।

3.1 প্রোগ্রামটা চালু করা ও প্রোগ্রাম উইনডো

প্রথমে প্রোগ্রামটা চালু করতে হবে । কমপিউটারের কোথায় প্রোগ্রামটা রাখা আছে খুঁজে দেখতে হবে। প্রোগ্রামটার আইকন পাশের ছবিতে দেওয়া হল। এটা ডেস্কটপে রাখা আইকনগুলোর মধ্যে আছে কিনা দেখো । না থাকলে স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে যে লিস্টটা পাবে তার মধ্যে আছে কিনা দেখো। এখানেও না থাকলে অন্য আর এক জায়গায় থাকতে পারে। সেটা খুঁজে দেখতে প্রথমে স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করো। যে লিস্টটা আসবে তার একদম শেষে দেখো **All Programs** (অল প্রোগ্রামস) আছে। সেটাতে ক্লিক করো বা কারসারকে তার ওপরে খানিকক্ষণ রাখো। এবার আর একটা লিস্ট আসবে।

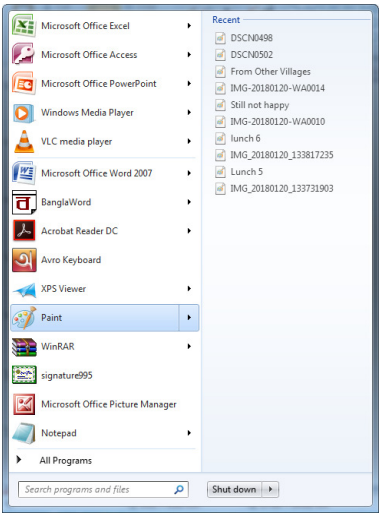

এই লিস্টটা দেখায় কমপিউটারটাতে যেসব প্রোগ্রাম স্টার্ট মেনুতেও দেখানো আছে সেইগুলো। মনে রেখো কমপিউটারটাতে

এমন আরও প্রোগ্রাম থাকতে পারে যেগুলো স্টার্ট মেনুতে বা তার অল প্রোগ্রামস লিস্টে দেখানো নেই। সেগুলো আরেকভাবে খুঁজতে হয়, যা আমরা পরে জানব। এই All Programs লিস্টটাতে কী কী আছে একবার দেখে নাও। কয়েকটা প্রোগ্রামের আইকন আছে আর কয়েকটা ফোল্ডার আইকন আছে। এর মধ্যে দেখো **Accessories** (অ্যাক্সেসরিস্) বলে একটা ফোল্ডার দেখানো আছে।

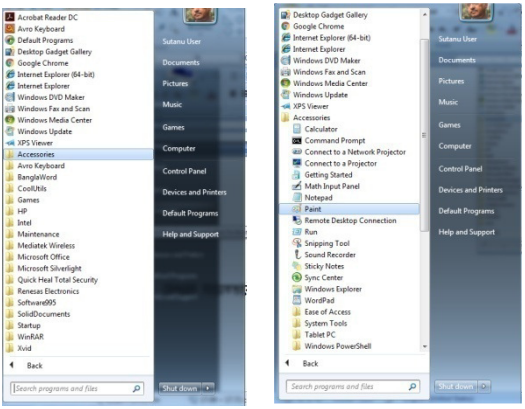

এটা হলো মাইক্রসফট উইনডোস অপারেটিং সিস্টেমটার মূল প্রোগ্রামগুলো ছাড়াও আরও যেসব ছোটখাটো আনুষঙ্গিক প্রোগ্রাম দেওয়া আছে, তার ফোল্ডার। এটাতে একবার ক্লিক করলেই ফোল্ডার ট্রী খুলবে ও তারপর আবার ক্লিক করলে ফোল্ডার ট্রী বন্ধ হয়ে যাবে। একবার ক্লিক করে অ্যাক্সেসরিস্ (Accessories) ফোল্ডার ট্রী খুলে দেখো একটা লিস্ট পাবে। এর মধ্যে Paint প্রোগ্রামটার আইকনটা পাবে। এটাতে একবার ক্লিক করলেই প্রোগ্রামটা চালু হয়ে যাবে। যে প্রোগ্রাম উইনডোটা খুলবে আগে সেটার বিভিন্ন অংশ ভাল করে দেখে নাও।

আমরা আগেই দেখছি প্রোগ্রামের উইনডোতে মিনিমাইজ, ম্যাকসিমাইজ/ রেসটোর আর ক্লোস বাটনগুলো থাকে ওপর দিকে ডান কোনায় । আর ডান ধার ও নিচের ধার বরাবর থাকে ভারটিকাল স্ক্রোল ও হরিজোন্টাল স্ক্রোল বার। তাই সেগুলি আর ওপরের ছবিতে দেখানো হয়নি।

উইনডোটার ওপরের ফ্রেমের অংশটাকে বলে **Title Bar** (টাইটেল বার)। এখানে দেখো বাঁ দিকের কোনায় পর পর তিনটে বাটন বা আইকন আছে। এক একটার ওপর

কারসারকে কিছুক্ষণ রেখে দেখো এক একটা নাম ফুটে উঠবে, **Save** (সেভ), **Undo** (আনডু), **Redo** (**রিডু**)। এগুলো দিয়ে কী হয় তা পরে আলোচনা করা হবে।

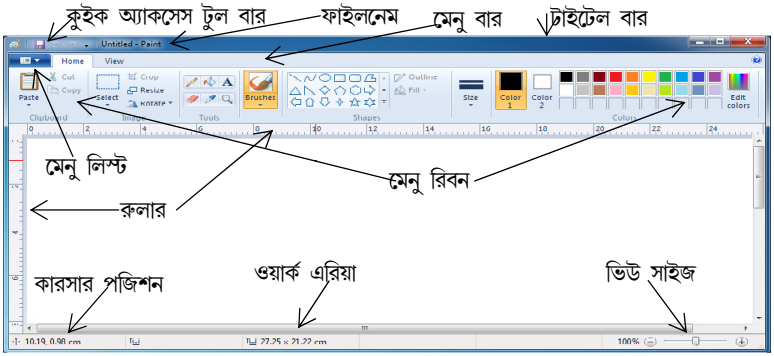

এই অংশটার নাম হল **Quick Access Toolbar** (কুইক অ্যাক্সেস টুল বার)। এর মানে প্রোগ্রামটা চালাবার সময় যেসব কাজ আমাদের বারে বারে করতে হয় (সেভ, আনডু, রিডু), সেগুলোকে চট করে পাওয়ার জন্য এখানে রাখা হয়। এর পাশে একটা লিস্টের চিহ্ন আছে। ওটাতে ক্লিক করলে দেখবে এখানে কী কী রাখা আছে ও আরও কী কী রাখা যায়। ওপরের এই অংশটাতে কুইক অ্যাকসেস টুলবারের পাশে লেখা থাকে পেইন্ট প্রোগ্রামটাতে এখন যে ফাইল খোলা আছে তার নাম বা **Filename** (ফাইলনেম)।

ওপরের এই অংশটার নিচেই লম্বা ফিতে মতো অংশটাকে বলে **Menu Bar** (মেনু বার)। এর একদম বাঁদিকের কোনাতে আছে **Menu List** (মেনু লিস্ট) যা লিস্ট চিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে। তার পাশে পর পর আছে **Home Tab** (হোম ট্যাব) আর **View Tab** (ভিউ ট্যাব) । মেনু বারের নিচে চওড়া ফিতে মতো লম্বা অংশটাকে বলে মেনু রিবন বা শুধু **Ribbon** (রিবন) । এই রিবন অংশটাকে বন্ধ করেও রাখা যায়। মেনুবারে গিয়ে রাইট ক্লিক করলে পাওয়া যাবে **Minimise Ribbon** (মিনিমাইস রিবন) । এটাতে ক্লিক করে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলে রিবনটা বন্ধ হয়ে যাবে। ফেরৎ পেতে গেলে আবার ওটা ক্লিক করে টিক চিহ্নটা তুলে দিতে হবে।

মেনু রিবনের নিচে ও উইনডোর বাঁ ধারে আছে **Ruler** (রুলার), যা দিয়ে আমরা ছবিটাতে মাপের আন্দাজ করতে পারি। আর নিচে বাঁ দিকের কোনায় পরিমাপ দিয়ে দেখায় কারসারটা ঠিক কোথায় আছে, বা **Cursor Position** (কারসার পজিশন)।

ছবি আঁকার জায়গাটা বা **Work Area** (ওয়ার্ক এরিয়া), যা আমরা ড্র্যাগ করে ছোট বড় করতে পারি, কতটা বড় তার পরিমাপটাও নিচে দেখানো আছে। নিচের ডান দিকের কোনায় আমাদের দেখাটাকে বা **View Size** (ভিউ সাইজকে) ছোট বড় করার উপায় দেওয়া আছে।

3.2 প্রোগ্রামের মেনু লিস্ট

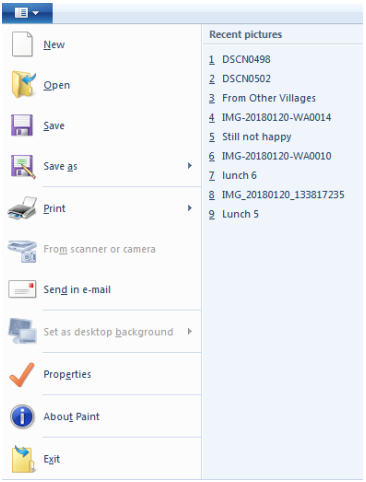

এবারে মেনু লিস্টটাতে ক্লিক করে দেখে নাও কী কী মেনু আসে, যেখান থেকে তুমি দরকার মতো এক একটি কাজ করতে পারবে। এই লিস্টটাতে দেখে নাও কী কী আছে। বিশেষ করে লক্ষ করো **New** (নিউ), **Open** (ওপেন), **Save** (সেভ), **Save As** (সেভ অ্যাস), **Print** (প্রিন্ট), **Exit** (এক্সিট), ইত্যাদি।

এইগুলো দিয়ে কী হয় সেটা বুঝব। প্রথমেই সহজ দুটো বলে নেওয়া যাক। Exit মানে হল প্রোগ্রামটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা প্রোগ্রামটাকে **Close** (ক্লোস) করা। Print মানে যে ছবিটা বা ফাইলটা এখন খোলা আছে সেটাকে প্রিন্টারের সাহায্যে কাগজে ছাপা। অন্য বিশেষ ধরনের ফাইল হিসাবেও প্রিন্ট করে কমপিউটারে রাখা যায়, যা আমরা পরে জানব।

New (নিউ) মেনু

পেইন্ট প্রোগ্রামটা চালুই হয় একটি নতুন ছবি আঁকার সাদা জায়গা দিয়ে, যাকে **Untitled** (আনটাইটেল্ড) বলে রাখা থাকে, কারণ এখনও তার কোনও ফাইল নাম তুমি দাওনি। ওপরে ফাইল নেমের জায়গায় এটা দেখতে পাবে। এখানে যা হোক কিছু আঁকার পর যদি তুমি আবার নতুন করে আঁকতে চাও, তাহলে মেনু লিস্টের New মেনুতে ক্লিক করো। [*মনে রেখো, পেইন্ট প্রোগ্রামে এক একবারে একটা করেই ছবি বা ফাইল খোলা থাকতে পারে। তাই নিউ করলে আগেরটা বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা সেভ করা না থাকলে তা আর পরে পাবে না।*]

প্রথমেই একটা বার্তা বা মেসেজ বক্স বা বলা যেতে পারে **Dialogue Box** (ডায়লগ বক্স) আসবে, যেখানে প্রশ্ন থাকবে—তুমি আনটাইটেল্ড ছবিটাকে সেভ করতে চাও কিনা,

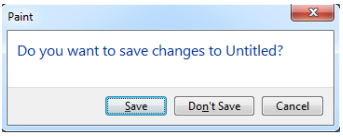

Do you want to save? (ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেভ?) । প্রথমে করে দেখো, **Cancel** (ক্যান্সেল) ক্লিক করলে, বা বক্সের ওপরের ডান কোনায় Close বাটনটায় ক্লিক করলে, অথবা কীবোর্ডের এসকেপ Esc কীইটা টিপলে এই মেসেজ বক্সটা চলে যায়, ও তুমি আগের আঁকা জায়গাতেই থেকে যাও। আর সেভ করতে চাই না, **Don't save** (ডোন্ট সেভ), ক্লিক করলে এখনকার ছবিটা উড়ে যায় ও নতুন একটা ছবি আঁকার জায়গা আসে, আবার **আনটাইটেল্ড** নাম দিয়েই ।

সেভ (Save) আর সেভ অ্যাস (Save As) মেনু

এবার দেখো, ডায়লগ বক্সের সেভ (Save) বাটনটায় ক্লিক করলে আরেকটা বড় ডায়লগ বক্স আসে। বাঁদিকের ওপরের কোনায় দেখ এই বক্সটার নাম দেওয়া আছে সেভ অ্যাস (Save As)। এখানে তোমাকে একটা ফাইলনেম দিতে হবে ও কোথায় ফাইলটা সেভ করে রাখতে চাও সেটাও বলে দিতে পারবে। সাধারণভাবে পেইন্ট প্রোগ্রামটা ফাইলকে সেভ করে রাখে লাইব্রেরির ভেতরে পিকচার ফোল্ডারে (Picture Folder–My Pictures)। এটাকে বলে এই প্রোগ্রামটাতে ফাইল সেভ করে রাখার **Default File Location** (ডিফল্ট ফাইল লোকেশন), মানে তুমি অন্য কোনও লোকেশন বা ফোল্ডার সিলেক্ট করে না দিলে ফাইলটা সেভ হবে এখানেই। এই ডায়লগ বক্সটার ওপরে অ্যাড্রেস বারে দেখো লাইব্রেরি–পিকচার এই পাথটাই লেখা আছে। তুমি চাইলে অন্য জায়গাতেও সেভ করে রাখতে পারো। তার জন্য আগে বাঁদিকের ফোল্ডার ট্রী থেকে সেই ড্রাইভ ও নির্দিষ্ট ফোল্ডারটা সিলেক্ট করো একবার লেফট ক্লিক করে। ওপরের অ্যাড্রেস বারে দেখো, পাথটা পাল্টে গিয়ে নতুন লোকেশন দেখাবে। এবার কাজ হল একটা ফাইলনেম টাইপ

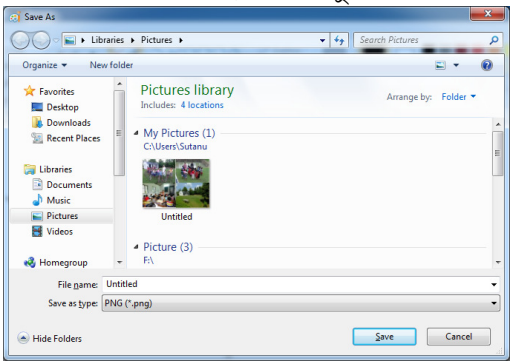

করে লেখা, Untitled লেখা ফাইল নেমের (File name) জায়গায়। এরপরে সেভ বাটনটায় ক্লিক করলেই এই নামে ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে নির্দিষ্ট ফোল্ডারটাতে ।

লক্ষ করে দেখো যে এই ডায়লগ বক্সটাতে ফাইলনেমের নিচেই আছে সেভ অ্যাস টাইপ (Save as type)। পাশে লেখা আছে PNG (*.png)। এটা বোঝায় ফাইলটার ধরন, যা ফাইলনেম এক্সটেনশনে লেখা থাকে। PNG ধরনটা হল পেইন্ট প্রোগ্রামে আঁকা ছবির **Default File Type (ডিফল্ট ফাইল টাইপ)**, যা আপনি দেওয়া থাকে। তুমি অন্য কোনও ধরন না চাইলে এই ডিফল্ট ধরনটাতেই ফাইল সেভ হবে। অন্য ধরনগুলো দেখা যাবে এই লাইনেই ডান পাশের লিস্ট বাটনটাতে ক্লিক করলে (যেমন, .png, .bmp, .jpeg, .jpg, .tiff, .gif ইত্যাদি)। এর যে কোনও একটি ধরন ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিলে ফাইলটা ওই ধরনের ফাইল হিসাবে সেভ হবে। সুতরাং সেভ আর সেভ অ্যাসের পার্থক্য হল, সেভ অ্যাস দিয়ে আমরা ফাইলটা কোন্ ধরনে সেভ করা হবে তা বলে দিতে পারি। তাছাড়া, সেভ অ্যাস দিয়ে আমরা একই ফাইলকে অন্য আরেকটা নাম দিয়েও সেভ করতে পারব।

মনে করো, তুমি একটা ফুলের ছবি এঁকেছ ও রঙ দিয়েছ লাল। আর ওই ছবিটাকে একটা ফাইল হিসাবে সেভ করে রেখেছ Flower-1 নাম দিয়ে। এবার তুমি চাইছ যে ওই ফুলটাকেই নীল রঙ করে আরেকটা ফাইলে সেভ করে রাখতে, যাতে আগের Flower-1 ফাইলটা যেমন আছে তেমনই থেকে যায়। এটা করতে সেভ অ্যাস করতে হবে। মেনু লিস্টটা খোলো আর এটাকেই সেভ অ্যাস করো (শুধু সেভ নয়)। সেভ অ্যাস করলেই যে ডায়লগ বক্সটা আসবে, তাতে এবার অন্য একটা ফাইলনাম দাও। মনে করো নাম দিলে Flower-2 ও সেভ করলে। এর ফলে Flower-1 ফাইলটা বন্ধ হয়ে যাবে ও দেখবে যে Flower-2 নামে আরেকটা ফাইলে ওই ছবিটাই খোলা আছে। এবার এটার রঙ পাল্টে নীল করে সেভ করো। এর ফলে দুটো ফাইলই, Flower-1 ও Flower-2, কমপিউটারে থেকে যাবে। এর সুবিধা হল ফুলের ছবিটা একবার এঁকে একটা ফাইলে সেভ করে রেখে তুমি শুধু রঙ পাল্টে পাল্টে আর এটা সেটা করে আলাদা আলাদা ছবি তৈরি করতে পারবে ও ফাইল হিসাবে রেখে দিতে পারবে সেভ অ্যাস করে। মূল ফুলের ছবিটা বার বার আঁকতে হবে না।

Open (ওপেন) মেনু

এবার মেনু লিস্টের ওপেন (Open) ব্যাপারটা বুঝে নিই। যে প্রোগ্রামটা চালাচ্ছি তার মেনু লিস্টের ওপেন (Open) দিয়ে আমরা কমপিউটারের হার্ড-ডিস্ক বা রিমুভেবল ডিস্কে রাখা কোনও ফাইলকে খুলতে পারি। কিন্তু যেকোনও ফাইল নয়, যে প্রোগ্রামটা

চালাচ্ছি তা দিয়ে খোলা যায় এমন ফাইলই হতে হবে। তা নয়ত একটা **Error Message** (এরার মেসেজ) আসবে। অর্থাৎ, এখানে পেইন্ট প্রোগ্রাম যেসব ধরনের ছবির ফাইল চিনতে পারে, (যেমন, .png, .bmp, .jpeg, .jpg, .tiff, .gif ইত্যাদি ফাইল এক্সটেনশন দেওয়া) কেবল সেগুলিই খোলা যাবে। মনে করো তুমি কমপিউটারে কোনও একটা ফোল্ডারে রাখা আছে এমনই একটা ফাইল খুলতে চাও। মেনু লিস্টের ওপেন-এ একবার ক্লিক করলেই স্ক্রিনে একটা ডায়লগ বক্স আসবে। লক্ষ করো, তার ওপরে বাঁদিকের দিকের কোনায় লেখা আছে এই বক্সটার নাম, Open।

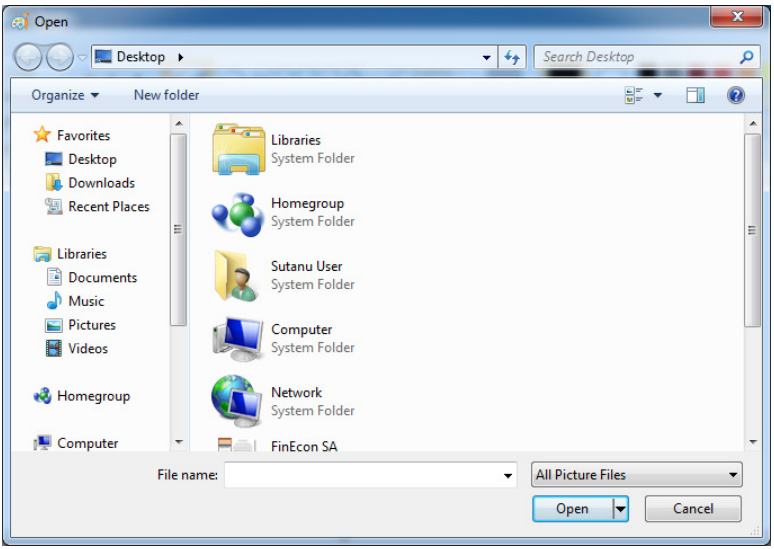

এই ডায়লগ বক্সটার অ্যাড্রেস বারে লক্ষ করো এটাতে এখন কোন্ ফোল্ডারটা খুলে দেখানো আছে। মনে রেখো, আগেরবার যে ফোল্ডারে কোনও ফাইল সেভ করা হয়েছিল, পেইন্ট প্রোগ্রামের ওপেন মেনু সেই ফোল্ডারটাই খুলে দেখাবে। হয়তো এই ফোল্ডারে তুমি যে ফাইলটা খুলতে চাইছ সেটা নেই, আছে অন্য কোনও ফোল্ডারে। সুতরাং, তোমাকে বাঁ পাশের অংশের ফোল্ডার ট্রিতে গিয়ে সেই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করতে হবে। লক্ষ করো, সিলেক্ট করা ফোল্ডারে যে ফাইল বা তার আরও সাবফোল্ডারগুলো আছে, সেগুলো ডানদিকের অংশে দেখানো হচ্ছে, আর অ্যাড্রেস বারে সিলেক্ট করা ফোল্ডারটার পাথ দেখাচ্ছে।

কোনও ফাইল সিলেক্ট করলে সেটার নাম এই ডায়লগ বক্সের ফাইলেনেমের জায়গায় দেখাবে। লক্ষ করো, ফাইলনেমের জায়গাটার ডান পাশে একটা লিস্ট বাটন আছে যেখানে দেখাচ্ছে অল্ পিকচার ফাইল। অর্থাৎ, কোনও ফোল্ডারে রাখা পিকচার ফাইলগুলোই শুধু এই ডায়লগ বক্সে দেখা যাবে। ফোল্ডারে রাখা অন্যান্য ফাইলও দেখতে চাইলে আমাদের এই লিস্টটাতে অল্ ফাইল সিলেক্ট করে নিতে হবে। কিন্তু সেগুলো অবশ্য পেইন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে খোলা যাবে না।

কোনও একটা পিকচার ফাইলকে খুলতে প্রথমে তাকে এই ডায়লগ বক্সে একবার ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হবে ও তারপর ডানদিকে নিচে রাখা ওপেন বাটনটা ক্লিক করতে হবে, অথবা ফাইলটাকেই ডাব্‌ল ক্লিক করতে হবে। এটা হল প্রোগ্রামটা আগে চালিয়ে নিয়ে তারপর তার মেনু লিস্টের সাহায্যে ফাইল খোলা। এছাড়া আরেক ভাবেও এক একটা ফাইল খোলা যেতে পারে, আগে প্রোগ্রামটা না চালিয়েও।

বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালিয়ে আমরা যেসব ফাইল ব্যবহারের জন্য তৈরি করে কমপিউটারে রাখি, উনডোস অপারেটিং সিসটেমের নিজস্ব নিয়মে সেগুলো আপনি যুক্ত হয়ে যায় ফাইলটি খোলার এমন কোনও উপযোগী প্রোগ্রামের সাথে, যা কমপিউটারে রাখা আছে। একে বলে ফাইলের **Linked Program** (লিংকড প্রোগ্রাম) বা এক একটা ফাইলের **Default program** (ডিফল্ট প্রোগ্রাম)। এই প্রোগ্রামটার আইকনটাই হয়ে যায় ফাইলটার নামের আগের আইকন। কোনও একটা ফাইল খোলার উপযোগী প্রোগ্রাম কমপিউটারে না থাকলে এটা ঘটবে না। তাই ফাইলের নামের আগে আইকন কিছু দেখাবে না। এই ডিফল্ট লিংক প্রোগ্রামের সুবিধা হল এই ধরনের ফাইল খুলতে প্রোগ্রামটা আগে না চালালেও হবে। উইনডোস এক্সপ্লোরার (ডেস্কটপের কমপিউটার আইকনটা) দিয়ে কমপিউটারে রাখা ফাইলটাকে খুঁজে নিয়ে ডাব্‌ল ক্লিক করলেই এই ডিফল্ট প্রোগ্রামটা চালু হয়ে ফাইলটাকে খুলে দেবে।

পেইন্ট প্রোগ্রামে তৈরি করা হলেও কিন্তু এইভাবে কোনও পিকচার ফাইলকে ডাব্‌ল ক্লিক করে পেইন্টে খোলা যাবে না। এর কারণ, পিকচার ফাইলগুলোর ডিফল্ট প্রোগ্রাম লিংক করা হয়ে যায় **Windows Photo Viewer** (উইনডোস ফটো ভিউয়ার) প্রোগ্রামটার সাথে। তাই এই ফাইলগুলোকে ডাব্‌ল ক্লিক করলে ছবিটা শুধু দেখা যাবে উনডোস ফটো ভিউয়ারে, পেইন্ট খুলবে না। কোনও পিকচার ফাইলে ডাব্‌ল ক্লিক করে এটা দেখে নাও। এই কারণে কোনও পিকচার ফাইলকে পেইন্ট প্রোগ্রামে সরাসরি খুলতে হবে একটু অন্যভাবে। ফাইলটার নামের ওপর **রাইট ক্লিক** করে দেখো একটা লিস্ট খুলবে, যেটা ওপরের দিকে রাখা আছে **Open with** (ওপেন উইথ)। এটাতে

ক্লিক করলে পাশে আরেকটা লিস্ট আসবে, যেখানে এই ফাইলটা খোলার উপযোগী প্রোগ্রামগুলো দেওয়া আছে। এবার এর মধ্যে পেইন্ট প্রোগ্রামটা ক্লিক করতে হবে।

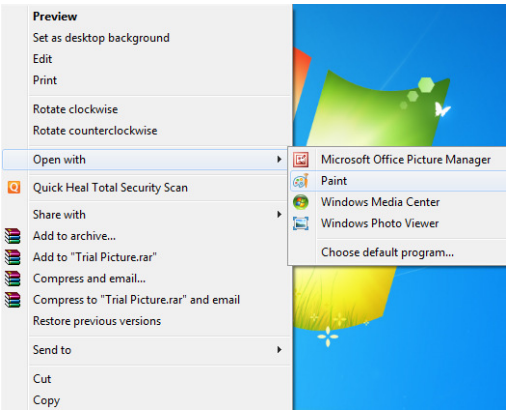

এছাড়া মনে রেখো, স্টার্ট মেনু লিস্টে রাখা প্রোগ্রাম গুলোতে সম্প্রতি ব্যবহার করা কয়েকটা ফাইলের লিস্ট পাশেই দেখা যায়। ওখান থেকেও ওই ফাইলগুলো ক্লিক করে খোলা যায়। আবার, কোনও প্রোগ্রাম চালু করলে তার মেনু লিস্টেও সম্প্রতি ব্যবহার করা কয়েকটা ফাইল দেখা যায়, তাই এখান থেকেও এই ফাইলগুলো খুলতে পারি।

3.3 প্রোগ্রামের মেনু ট্যাব, রিবন গ্রুপ ও পেইন্ট প্রোগ্রামটি ব্যবহার

প্রোগ্রাম উইনডোতে মেনু বার ও মেনু রিবন অংশ দুটো আমরা আগে লক্ষ করেছি । এবার আমরা জানব এগুলোতে কী আছে ও সেগুলো দিয়ে কী করা যায় । মেনু বারে থাকে বিভিন্ন **Menu Tab** (মেনু ট্যাব) । এই পেইন্ট প্রোগ্রাম উইনডোর মেনু বারে দুটো মাত্র মেনু ট্যাব আছে — **Home Tab** (হোম ট্যাব) আর **View Tab** (ভিউ ট্যাব)। পরে দেখবে, **Microsoft Office** (মাইক্রসফট অফিস) প্রোগ্রামগুলোতে মেনু বারে আরও বেশি সংখ্যক মেনু ট্যাব আছে।

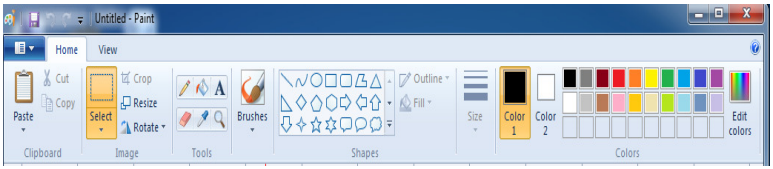

মেনু বারের নিচে চওড়া বার অংশটা মেনুর রিবন, যেটাকে আবার বিভিন্ন অংশে ভাগ করা আছে। এগুলো হল **Ribbon Group** (রিবন গ্রুপ)। লক্ষ করো, এখানে দেখা যাচ্ছে মেনু বারে হোম ট্যাবটা হাইলাইটেড, মানে সিলেক্ট হয়ে আছে আর রিবন বারে

পর পর অংশগুলোর নিচে নাম দেওয়া আছে **Clipboard** (ক্লিপবোর্ড), **Image** (ইমেজ), **Tools** (টুল্‌স), **Shapes** (শেপ্‌স), আর **Colors** (কালার্‌স)।

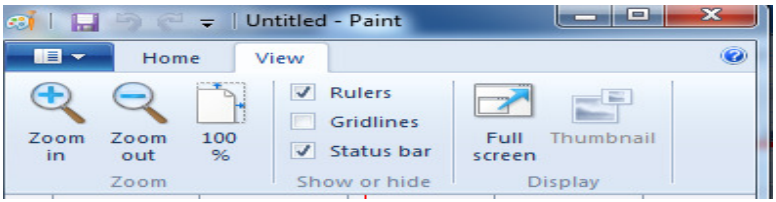

এগুলোর কোন্‌টার কী মানে আর কী কাজে লাগে সেটা পরে বলা হবে। আগে দেখে নাও, ওপরের মেনু বারে যে মেনু ট্যাবটা সিলেক্ট করা হবে, রিবন বারে তারই মেনুগুলো দেখাবে রিবন গ্রুপ হিসাবে। মেনু বারে ভিউ ট্যাবটাতে ক্লিক করো। দেখো, মেনু বারে ভিউ ট্যাবটা এবার হাইলাইট মানে সিলেক্ট করা হল আর রিবনে রাখা গ্রুপগুলো এখন পাল্টে গেল। এখন এল তিনটে মাত্র রিবন গ্রুপ — **Zoom** (জুম), **Show or hide** (শো অর্‌ হাইড), আর **Display** (ডিসপ্লে)। এবারে আবার মেনু বারে হোম ট্যাবটা ক্লিক করে দেখো, রিবনে আবার হোম মেনুর গ্রুপগুলো দেখাবে।

অর্থাৎ, মেনু বারে রাখা মেনু ট্যাবগুলো হলো এক একটা ধরনের মেনু গুচ্ছের নাম। মেনু বারে যে মেনু গুচ্ছটি আমরা সিলেক্ট করব, রিবন বারে সেই মেনু গুচ্ছের মেনুগুলোকে এক একটা রিবন গ্রুপ হিসাবে দেখাবে। প্রোগ্রামটা দিয়ে কাজ করার সময় আমাদের এই রিবন গ্রুপগুলো থেকে প্রয়োজন মতো মেনু সিলেক্ট করে নিতে হবে একবার ক্লিক করে। লক্ষ করো, রিবন গ্রুপে কোনও কোনও মেনুর পাশে লিস্ট বাটনটা দেওয়া আছে। এর মানে এই লিস্টটাতে ক্লিক করে আমরা ওই মেনুটার সম্পর্কিত আরও কিছু মেনু পাবো সিলেক্ট করার জন্য। যেমন দেখো, **Brushes Menu** (ব্রাশেস মেনু) আর **Size Menu** (সাইজ মেনু) এই দুটো মেনুর নিচে লিস্ট চিহ্ন আছে। এগুলোতে ক্লিক করে দেখতে পারো।

এবারে আমরা দেখব রিবনে রাখা মেনুগুলো দিয়ে প্রোগ্রামটা চালাবার সময় আমরা কী কী কাজ করতে পারি। প্রথমে দেখি হোম মেনু গুচ্ছটাকে সিলেক্ট করে। রিবনের গ্রুপে বাঁদিক থেকে পাই ক্লিপবোর্ড, যার মধ্যে আছে কাট, কপি, পেস্ট। **ক্লিপবোর্ডের** মানে কমপিউটারের মেমরিতে রাখা। আমরা আগে **কাট, কপি পেস্ট** শিখেছি। পেইন্ট প্রোগ্রামে কোনও ছবির কোনও অংশ (বা পুরোটাই) আমরা কাট বা কপি করে ক্লিপবোর্ডে রাখতে পারি ও তারপর এই তাকে ছবিটারই অন্য কোথাও বা অন্য কোনও

প্রোগ্রামে করা কোনও কাজের (ফাইলে) কোথাও পেস্ট করতে পারি (যদি সেখানে ছবি পেস্ট করা সম্ভব হয়)। কাট আর কপির পার্থক্যটা মনে রেখো। যদি এক জায়গা থেকে মুছে দিয়ে অন্য জায়গায় দিতে চাও তাহলে কাট-পেস্ট আর যদি এক জায়গা থেকে না-মুছে নিয়ে আরেক জায়গাতেও রাখতে চাও তাহলে কপি-পেস্ট।

কাট বা কপি করতে গেলে আগে ছবির অংশটাকে সিলেক্ট করতে হবে। এটা করার ব্যবস্থা আছে রিবন গ্রুপের পরের গ্রুপ, **ইমেজে**। এই গ্রুপে রাখা **Select Menu** (সিলেক্ট মেনু) ক্লিক করো ও তারপর ছবির পছন্দ মতো অংশের কোনও একটি কোনা থেকে শুরু করে মাউসের লেফট বাটনকে চেপে রেখে বিপরীত কোনা পর্যন্ত গিয়ে বাটনটা ছাড়ো। দেখবে লাইন দিয়ে ওই অংশটা ঘেরা হবে। এই অবস্থা রেখেই এবার কপি বা কাট বাটন ক্লিক করো। ওই অংশটা ক্লিপবোর্ডে (কমপিউটার মেমরি) রাখা হয়ে যাবে। এবার তুমি ইচ্ছে মতো জায়গায় ছবির এই নির্বাচিত অংশটাকে পেস্ট করতে পারো। অন্য কোনও ছবির ফাইল খুলে সেখানেও পেস্ট করতে পারো। মনে রেখো, যতক্ষণ না তুমি অন্য কোনও কিছু কপি বা কাট করে ক্লিপবোর্ডে রাখবে, ততক্ষণ এটাই ক্লিপবোর্ডে থেকে যাবে ও বার বার পেস্ট করতে পারবে। ছবির কোনও একটি অংশ সিলেক্ট করার আর একটা সুবিধা হল সেই অংশটাকে টেনে ছোট বড় করা যায়। আবার শুধু সেই অংশটাকে নিয়েই আরেকটা ছবি তৈরি করা যায়, যাকে বলে **Crop** (ক্রপ) করা। এগুলো নিজে করে দেখো।

ছবি আঁকার সময় প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে **টুল্‌স, শেপ্‌স** আর **কালার্‌স** ট্যাবের মেনুগুলো। এগুলোর এক একটা বাটন ব্যবহারের জন্য ক্লিক করে নিতে হবে। লক্ষ করো, যেটাতে ক্লিক করা হবে সেটা হাইলাইট হয়ে থাকবে, যতক্ষণ না অন্য কোনও মেনু ক্লিক করে নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের Brushes Menu (ব্রাশেস মেনু) ক্লিক করে নিয়ে তারপর Size Menu (সাইজ মেনু) ক্লিক করে পছন্দ মতো সাইজ নাও। এবার কালার থেকে কোনও একটা কালার নিয়ে ওই ব্রাশটা দিয়ে এঁকে দেখো। লেফট বাটনটা চেপে মাউস যেমন সরাবে সেইরকম আঁকা হবে । আকাঁর মধ্যে কোনও পুরোটা ঘেরা জায়গা থাকলে সেটা কোনও রঙ ক্লিক করে নিয়ে তা দিয়ে ভর্তি বা **Fill** (ফিল) করতে পারো। কিছু আকার বা শেপস করে রাখা আছে। সেগুলো থেকো ক্লিক করে কোনও একটা নিয়ে ছবিতে ব্যবহার করতে পারো। তোমার পছন্দ মতো রঙও তুমি বানিয়ে নিতে পারো **Edit Color** (এডিট কালার) থেকে। এগুলোর কোনটা দিয়ে কী হয় সবই নিজে করে দেখে নিতে হবে । আগে এইগুলো জেনে নিয়ে তারপর কোনও একটা ছবি আঁাকার চেষ্টা করো, ও সেটাকে সেভ করে রাখো। পরে সেইটা

থেকেই আরও কয়েকটা অন্য ছবি তৈরি করো। আঁকার সময় কোনও কিছু ভুল আকাঁ তখনই বোঝা গেলে কুইক অ্যাকসেস টুলবারের **Undo** (আনডু) ব্যবহার করতে পারো। ঠিক আগে যা করেছিলে সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আর **Redo** (রিডু) করে অবশ্য সেটা আবার ফেরৎ পেতে পারো। আঁকার সময় মাঝে মধ্যেই সেভ করা ভাল। কুইক অ্যাকসেস টুলবারে Save (সেভ) বাটনটা ক্লিক করে এটা করতে পারবে।

মেনু বারের ভিউ (View) মেনু গুচ্ছটা নিলে আমরা রিবনে যে গ্রুপগুলো পাই তাতে ছবিটাকে নানা ভাবে ছোট বড় করে দেখার সুযোগ করে রাখা আছে। মনে রেখে **Full screen** (ফুল স্ক্রিন) করলে তা থেকে বের হবার উপায় হল কী বোর্ডের **Esc** (এসকেপ) বাটনটা টেপা।

মনে রেখো, যে কোনও প্রোগ্রাম চালানো শেখা হয় সেটা বার বার নানা কাজে ব্যবহার করে।

অনুশীলন: পাঠ 3-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পর পর যেভাবে শেখা হয়েছে, শব্দগুলো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো পর পর পড়ে মনে করো, পাঠে কী বলা হয়েছে। মনে ঠিক না এলে আবার পাঠের ওই জায়গাটা দেখে নাও।

Paint (পেইন্ট)
Accessories (অ্যাকসেসরিস্)
Save (সেভ)
Redo (রিডু)

Filename (ফাইলনেম)
Menu List (মেনু লিস্ট)
View Tab (ভিউ ট্যাব)
Minimise Ribbon (মিনিমাইস রিবন)
Cursor Position (কারসার পজিশন)
View Size (ভিউ সাইজকে)
Open (ওপেন)
Save As (সেভ অ্যাস্)
Exit (এক্সিট)
Untitled (আনটাইটেল্ড)

All Programs (অল প্রোগ্রামস)
Title Bar (টাইটেল বার)
Undo (আনডু)
Quick Access Toolbar (কুইক অ্যাক্সেস টুল বার)
Menu Bar (মেনু বার)
Home Tab (হোম ট্যাব)
Ribbon (রিবন)
Ruler (রুলার)
Work Area (ওয়ার্ক এরিয়া)
New (নিউ)
Save (সেভ)
Print (প্রিন্ট)
Close (ক্লোস)
Dialogue Box (ডায়লগ বক্স)

Do you want to save? (ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেভ?)

Cancel (ক্যান্সেল)

Don't save (ডোন্ট সেভ)

Default File Location (ডিফল্ট ফাইল লোকেশন)

Default File Type (ডিফল্ট ফাইল টাইপ)

Error Message (এরার মেসেজ)

Linked Program (লিংকড প্রোগ্রাম)

Default program (ডিফল্ট প্রোগ্রাম)

Windows Photo Viewer (উইনডোস ফটো ভিউয়ার)

Open with (ওপেন উইথ)

Menu Tab (মেনু ট্যাব)

Home Tab (হোম ট্যাব)

View Tab (ভিউ ট্যাব)

Microsoft Office (মাইক্রসফট অফিস)

Ribbon Group (রিবন গ্রুপ)

Clipboard (ক্লিপবোর্ড)

Iamge (ইমেজ)

Tools (টুল্স)

Shapes (শেপ্স)

Colors (কালার্স)

Zoom (জুম)

Show or hide (শো অর্ হাইড)

Display (ডিসপ্লে)

Brushes Menu (ব্রাশেস মেনু)

Size Menu (সাইজ মেনু)

Select Menu (সিলেক্ট মেনু)

Crop (ক্রপ)

Fill (ফিল)

Edit Color (এডিট কালার)

Full screen (ফুল স্ক্রিন)

পাঠ 4. মাইক্রসফট্ অফিস — ওয়ার্ড প্রোগ্রামটির ব্যবহার

4.1 ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি করা কোনও ফাইল সেভ করা, প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে

4.1.1 প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, ফাইল সেভ করা, সেভ করা ফাইল খোলা

4.1.2 প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে

4.2 কীভাবে টাইপ করে লেখা হয়

4.2.1 Insertion Point (ইনসারশন পয়েন্ট)

4.2.2 Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড)

4.2.3 Delete Text (ডিলিট টেক্সট)

4.2.4 Selection (সিলেকশন)

4.2.5 Undo (আনডু), Redo (রিডু), ও Repeat (রিপিট)

4.3 Editing Text (এডিটিং টেক্সট) ও Formatting Text (ফরম্যাটিং টেক্সট)— লেখার ভুল শুদ্ধ ও হরফ পরিবর্তন করা

4.3.1 Delete Text (ডিলিট টেক্সট)

4.3.2 Insert Text (ইনসার্ট টেক্সট)

4.3.3 Overtype Text (ওভারটাইপ টেক্সট)

4.3.4 Copy (কপি) Paste (পেস্ট) ও Cut (কাট) Paste (পেস্ট)

4.3.5 Find (ফাইন্ড) ও Replace (রিপ্লেস)

4.3.6 Spell Check (স্পেল চেক) ও Grammar Check (গ্রামার চেক)

4.3.7 Font (ফন্ট), Font Size (ফন্ট সাইজ) ও Font Style (ফন্ট স্টাইল)

4.3.8 Font Effect (ফন্ট এফেক্ট) ও Font Color (ফন্ট কালার)

4.3.9 Text Highlight (টেক্সট হাইলাইট) ও Character Spacing (ক্যারেকটার স্পেসিং)

4.4 Paragrap (প্যারাগ্রাফ) ও Page Layout (পেজ লে-আউট)

4.4.1 Align Text (অ্যালাইন টেক্সট)

4.4.2 Line Spacing (লাইন স্পেসিং)

4.4.3 Space Before/After (স্পেস বিফোর/আফটার)

4.4.4 Shading (শেডিং) ও Border (বর্ডার)

4.4.5 Bullets (বুলেটস), Numbering (নাম্বারিং) ও Indent (ইনডেন্ট)

4.4.6 Sort (সর্ট), Show/Hide (শো/হাইর্ড)

4.4.7 Tab Stops (ট্যাব স্টপ্স)

4.5 Page Layout (পেজ লে-আউট)

4.5.1 Page Size (পেজ সাইজ), Orientation (ওরিয়েন্টেশন), Margin (মার্জিন)

4.5.2 Section Break (সেকশন ব্রেক) New Page (নতুন পাতা)

4.6 পরবর্তী পর্যায়ে শেখার — প্রিন্ট ও অন্যান্য মেনু

অনুশীলন: পাঠ 4-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পাঠ 4. মাইক্রসফট্ অফিস—ওয়ার্ড প্রোগ্রামটির ব্যবহার

Microsoft Office (মাইক্রসফট অফিস) হল একটা প্রোগ্রামগুচ্ছের নাম, যার মধ্যে আছে বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম। উইনডোস স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে যে লিস্টটা আসে তার নিচে রাখা **All Programs** (অল্ প্রোগ্রামস) আইটেমটাতে কারসারটা রাখো বা ক্লিক করো। আরেকটা লিস্ট আসবে। এর মধ্যে দেখো মাইক্রসফট অফিস নামে একটা ফোল্ডার আছে। ওটাকে ক্লিক করে খোলো। মাইক্রসফট অফিসের মধ্যে রাখা প্রোগ্রামগুলোর লিস্টটা পাবে। এই প্রোগ্রামগুলোর এক একটা ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে। সাধারণ কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহারে হয় Microsoft Office **Word** (ওয়ার্ড) আর Microsoft Office **Excel** (এক্সেল)। এছাড়া Microsoft Office **Powerpoint** (পাওয়ারপয়েন্ট) আর Microsoft Office **Access** (অ্যাক্সেস) প্রোগ্রাম দুটো অফিসের বিশেষ কিছু কাজে ব্যবহার হয়। মাইক্রসফট অফিসের মূল প্রোগ্রামগুলো হল এই চারটি। অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোর ব্যবহার সাধারণত তেমন প্রয়োজন হয়না। আমরা আপাতত ওয়ার্ড ও এক্সেল প্রোগ্রাম চালানো শিখব। আমরা এখানে দেখব Windows 7 এর সাথে Microsoft Office 7। Windows 10 ও Microsoft Office 10-এর আরম্ভের উইনডো একটু অন্যরকম হয়। বাকিসব মোটের ওপর একই।

এই প্রোগ্রামগুলোর এক একটার আইকন সাধারণত ডেস্কটপে, অথবা টাস্কবারে রাখা হয়। সেখান থেকেই ক্লিক করে আমরা এগুলো চালাতে পারব। ডেস্কটপ বা টাস্কবারে রাখা না থাকলে আমরা এগুলো পাব উইনডোস স্টার্ট মেনু লিস্টে অথবা All Programs (অল্ প্রোগ্রামস) আইটেমের মাইক্রসফট অফিস ফোল্ডারে। Microsoft Office 7-এর পরের ভারশন Microsoft Office 10-এ আইকনগুলো খানিকটা পাল্টানো হয়েছে। ছবিগুলো নিচে দেওয়া হল।

Microsoft Office 7

Microsoft Office 10

মনে রাখতে হবে যেকোনও প্রোগ্রামই শেখা হয় তা বারংবার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ও ব্যবহারের না থাকলে তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া একটা প্রোগ্রাম দিয়ে যা যা করা যায় তার সবগুলোই শেখার জন্য শিখে কোনও লাভ হয় না। প্রয়োজন অনুসারে বার বার ব্যবহার করলে তবেই তা শেখা যায় ও মনেও থাকে। তাই আমরা ব্যবহারের ন্যূনতম কয়েকটা দিকই আপাতত শিখব। বাকিগুলো পরবর্তীকালে ব্যবহারের প্রয়োজন হলে শিখে নেওয়া যাবে।

মাইক্রসফট্ অফিস ওয়ার্ড

মাইক্রসফট্ ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার সাহায্যে আমরা যেকোনও ধরনের লেখালিখির কাজ, চিঠিপত্র লেখা থেকে ছবিসহ বইপত্র লেখা, ইত্যাদি সবই করতে পারি। এর জন্য অবশ্য কীবোর্ডের সাহায্যে লেখার বর্ণগুলো টাইপ করতে হবে। সেই কারণে কীবোর্ডে ইংরেজি বর্ণগুলো কীভাবে সাজানো আছে সেটা লক্ষ করে রাখতে হবে। পরে অবশ্য টাইপ করতে করতেই এটা সড়গড় হয়ে যাবে।

লেখালিখির বিভিন্ন ধরন তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন হয় মোটামুটি তা সবই করার উপায় এই ওয়ার্ড প্রোগ্রামটাতে আছে। সুতরাং লেখালিখির সময় বিশেষ কিছু একটা করা প্রয়োজন হলে সেটা করার উপায় খুঁজে দেখতে হবে **Program Menu** (প্রোগ্রাম মেনু), যেখানে বিভিন্ন যা কিছু করার উপায় দেওয়া থাকে। আমরা এখানে লেখালিখির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপায়গুলো শিখব।

মনে রেখো, ওয়ার্ড প্রোগ্রামটাতে আমরা পাই একটা লেখালেখি করার জায়গা, যাকে বলে **Document Area** (ডকুমেন্ট এরিয়া) ও সেখানে লেখালিখির পর আমরা তাকে একটা ফাইল হিসাবে সেভ করতে পারি, যাকে বলা হয় **Document File** (ডকুমেন্ট ফাইল), ও **Filename Extension** (ফাইলনেম এক্সটেনশন) হয় .docx (অথবা আগেকার ভারশনে .doc)।

মাইক্রসফট্ অফিস এক্সেল

এই প্রোগ্রামটার ব্যবহার হয় বহু সংখ্যা নিয়ে প্রয়োজন মতো তথ্য সঞ্চয় ও বিভিন্ন রকমের হিসেবনিকেশ করার জন্য। একই হিসাবের সূত্র বা ফরমুলা খুব সহজেই বারে বারে ব্যবহার করা, ও প্রয়োজন মতো বিভিন্ন ফরমুলাও তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া রাশিবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী কিছু হিসেব ও চিত্রও তৈরি করা যায় এটা দিয়ে । এখানেও আমরা পাই একই ধরনের প্রোগ্রাম উইনডো, যেখানে মেনু থেকে আমরা ঠিক করে নিতে পারি কোন্ কাজটা করব।

মনে রেখো, ওয়ার্ড প্রোগ্রামটাতে আমরা পাই বহু সংখ্যা নিয়ে হিসেবনিকেশ করার একটা জায়গা, যাকে বলে **Worksheet Area** (ওয়ার্কশীট এরিয়া) ও সেখানে তথ্য সঞ্চয় ও হিসেবনিকেশর পর আমরা তাকে একটা ফাইল হিসাবে সেভ করতে পারি, যাকে বলা হয় **Workbook File** (ওয়ার্কবুক ফাইল), ও Filename Extension হয় .xlsx (অথবা আগেকার ভারশনে .xls)।

মাইক্রসফট্ অফিস পাওয়ারপয়েন্ট

এই প্রোগ্রামটা দিয়ে আমরা **Slide** (স্লাইড) তৈরি করি, যেগুলো ওভারহেড **Projector** (প্রোজেক্টার) দিয়ে সিনেমার মতো কোনও স্ক্রিনের ওপর ছবি ফেলে পর পর দেখানো যায়। পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে তৈরি স্লাইডগুলো এই ভাবে দেখালে অনেকের সামনে কোনও একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখা বা **Presentation** (**প্রেসেন্টেশন**) করার সময় সুবিধা হয়। বক্তব্যের মূল কথা ও আনুসঙ্গিক তথ্যগুলো বলার সাথে সাথে ছবিতেও দেখানো যায়। এই প্রোগ্রামটা দিয়ে স্লাইডগুলো তৈরি করার জন্য আমরা পাই প্রোগ্রাম উইনডো, যেখানে মেনু থেকে আমরা ঠিক করে নিতে পারি স্লাইডগুলো কী ধরনের করব। পাওয়ারপয়েন্ট প্রোগ্রামটাতে আমরা পাই প্রেসেন্টেশনের স্লাইডগুলো তৈরি করার জায়গা, যাকে বলে **Slide Area** (**স্লাইড এরিয়া**) ও সেখানে স্লাইডগুলো তৈরি করার পর আমরা তাকে একটা ফাইল হিসাবে সেভ করতে পারি, যাকে বলা হয় **Presentation File** (প্রেসেন্টেশন ফাইল), ও Filename Extension হয় .pptx (অথবা আগেকার ভারশনে .ppt)। তৈরি করার পর এই ফাইলটাকেই আমরা প্রেসেন্টেশনের সময় **Slide show** (স্লাইড শো) করে দেখাতে পারি।

মাইক্রসফট্ অফিস অ্যাক্সেস

কোনও বিষয়ের নানাবিধ তথ্য সঞ্চয় করে রাখা ও প্রয়োজনমতো সেখান থেকে নির্দিষ্ট তথ্য চট করে খুঁজে বার করার ব্যবস্থা করাকে বলা হয় **Database Management** (ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট)। অ্যাক্সেস একটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করার প্রোগ্রাম যা দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারের জন্য ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে নিতে পারি। এই প্রোগ্রামটা ব্যবহারে একটু বিশেষ পারদর্শিতা প্রয়োজন হয়, কারণ এখানে বিবেচনা করে স্থির করতে হয় তথ্য সঞ্চয় করার সারণি বা **Tables** (টেবলস) গুলো তৈরি করা, তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক বা **Relationships** (রিলেশনশিপ্স) দিয়ে যুক্ত করা, তথ্য খুঁজে বার করার **Query** (কোয়েরি) গুলো তৈরি করা ও তারপর প্রয়োজনমাফিক বিভিন্ন **Forms** (ফর্মস) ও **Reports** (রিপোর্টস) নির্মাণ করা। এই কাজগুলো আমরা প্রোগ্রাম উইনডোর মেনুগুলো

থেকে করতে পারি ও তাকে একটা ফাইল হিসাবে সেভ করতে পারি, যাকে বলা হয় **Database Application File** (ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন ফাইল) । এই ফাইলের Filename Extension হয় .accdb (অথবা আগেকার ভারশনে .mdb)।

4.1 ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি করা কোনও ফাইল সেভ করা, প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে

4.1.1 **প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, ফাইল সেভ করা, সেভ করা ফাইল খোলা**

আমরা আগের পাঠে **Paint (পেইন্ট)** প্রোগ্রামটা চালাবার সময় প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, ফাইল সেভ করা ইত্যাদি যেভাবে করেছিলাম, এখানেও সেই একই ভাবে এগুলো করা যাবে। তাই এগুলো আর এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

প্রোগ্রামটা খুলে উইনডোর বাঁদিকের ওপরের কোনায় অফিস বাটনে ক্লিক করে যে মেনু লিস্ট পাবে সেটা দেখে রাখো। এখানে আছে পেইন্ট প্রোগ্রামের মতোই লিস্টের বাঁদিকে **New** (নিউ), **Open** (ওপেন), **Save** (সেভ), **Save As** (সেভ অ্যাস), **Print** (প্রিনট) ইত্যাদি, আর ডানদিকে দেখায় সম্প্রতি ব্যবহার করা কয়েকটা ফাইলের তালিকা, ও নিচে আছে **Word Options** (ওয়ার্ড অপ্শনস) আর **Exit** (এক্সিট)। এগুলো আগের পাঠে পেইন্ট প্রোগ্রামটার আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবার দেখে নাও। Word Options (ওয়ার্ড অপ্শনস) দিয়ে আমরা প্রোগ্রামটার বিশেষ কয়েকটা বিষয় নির্দিষ্ট করতে পারি, যা পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ওয়ার্ড প্রোগ্রামে তুমি পর পর অনেকগুলো ফাইলও খুলতে পারো, আগেরটা বন্ধ না করেই (এটা পেইন্ট প্রোগ্রামে হয়না)। অফিস বাটনে ক্লিক করে মেনু লিস্ট থেকে পর পর কয়েক বার New (নিউ) করে **Blank Document** (ব্ল্যাংক ডকুমেন্ট) সিলেক্ট করো ও **Create** (ক্রিয়েট) করে দেখো। নতুন নতুন ডকুমেন্ট উইনডো তৈরি হবে, ও ওয়ার্ড সেগুলোর নাম দিয়ে দেবে ডকুমেন্ট 1, ডকুমেন্ট 2, ডকুমেন্ট 3 ইত্যাদি।

যেকোনও ডকুমেন্টে লেখালিখি বা পরিবর্তন করে চট করে সেভ করার উপায় হলে কুইক অ্যাকসেস টুলবারে রাখা **Save Icon** (সেভ আইকন) বা 💾 চিহ্নটাতে মাউস ক্লিক করা অথবা কীবোর্ডে **Ctrl+S** (সিটিআরএল+এস) টেপা। কোনও নতুন ডকুমেন্ট প্রথমবার সেভ করার সময় **Dialog Box** (ডায়লগ বক্স) আসবে, যেখানে সেভ করার **Folder Location** (ফোল্ডার লোকেশন) আর **Filename** (ফাইলনেম) দিতে হবে।

মাউস দিয়ে ক্লোস বাটনটা ক্লিক করে অথবা কীবোর্ডে **Alt+F4** (অল্ট+এফ ফোর) টিপে প্রোগ্রামটা বন্ধ করা যাবে।

4.1.2 **প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে**

আমরা এখন শুধু মোটামুটিভাবে জানার জন্য দেখে রাখব ওয়ার্ড প্রোগ্রাম উইনডোটাতে কী কী দেওয়া থাকে। এত কিছু প্রথমেই শেখা বা মনে রাখা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন মতো এগুলির সঠিক ব্যবহার শেখা যাবে পরে প্রোগ্রামটা দিয়ে কাজ করার সময়। ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শেখা হলে তবেই তা মনে থাকবে। সুতরাং, এগুলির অর্থ বোঝা ও মনে রাখার চেষ্টা না করাই ভাল। শুধু এগুলি সম্বন্ধে আপাতত খানিকটা পরিচিত হলেই চলবে।

প্রোগ্রাম উইনডোটার একদম ওপরে দেখো **Title Bar** (টাইটেল বার), যেখানে লেখা থাকে যে ফাইলটা খোলা আছে তার নাম। মনে রেখো, ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা খোলা হলে নিজে থেকেই একটা ফাইল নাম দিয়ে দেয়, **Document 1** (ডকুমেন্ট 1), যদিনা তুমি অন্য কোনও ফাইল খোলো। পেইন্ট প্রোগ্রামটার মতোই এখানেও টাইটেল বারে আছে **Quick Access Toolbar** (কুইক অ্যাক্সেস টুল বার), তার বাঁদিকের কোনায় **Office Button** (অফিস বাটন), যা থেকে আমরা পাই **Menu List** (মেনু লিস্ট)। টাইটেল বারের একদম ডানদিকের কোনায় আছে **মিনিমাইস, ম্যাক্সিমাইস/রেসটোর, ক্লোস** বাটনগুলো, আর নিচে আছে **Menu Bar** (মেনু বার) ও তার নিচেই আছে **Ribbon Bar** (রিবন বার)।

মেনু বারে রাখা **Menu Tab** (মেনু ট্যাব) ও রিবন বারে রাখা **Ribbon Group** (রিবন গ্রুপ) গুলো থেকে আমরা দরকার মতো মেনু ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিয়ে লেখার সময় ব্যবহার করতে পারি। আমরা আগেই জেনেছি যে মেনু বারে রাখা মেনু ট্যাবগুলো হল এক একটা মেনুগুচ্ছ, যার মেনুগুলোকে আমরা পাই রিবন বারে রাখা রিবন গ্রুপ হিসাবে।

ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার একটা বাড়তি বিষয় হল, **Insert** (ইনসার্ট) মেনু ট্যাবের মেনুগুচ্ছ বা রিবনে রাখা **Tables** (টেবলস), **Shapes** (শেপ্স), **Header** (হেডার), **Footer** (ফুটার), **Text Box** (টেক্সট বক্স), **Word Art** (ওয়ার্ড আর্ট) ইত্যাদি মেনুগুলো ব্যবহার করলেই আমরা মেনু বারে কয়েকটা বাড়তি মেনুগুচ্ছ পাবো, যেমন **Layout** (লেআউট), **Design** (ডিসাইন), **Format** (ফরম্যাট) ও তাদের মেনুগুলো আবার রিবনে দেখাবে। এটা আপাতত জেনে রাখলেই চলবে।

মেনু বারে এক একটা মেনু ট্যাব ক্লিক করলে তার মেনু গুচ্ছগুলো দেখায় রিবন বারে রিবন গ্রুপ হিসাবে। এই রিবন গ্রুপগুলোতে রাখা আছে এক একটা মেনু, যা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেওয়া যায়। রিবন গ্রুপগুলোর তলায় গ্রুপটার নাম দেওয়া আছে, আর পাশে একটা লিস্ট বাটন আছে। এই লিস্ট বাটনটা ক্লিক করলে ওই গ্রুপের মেনুগুলো নিয়ে কাজ করার একটা **ডায়লগ বক্স** আসে, যেখানে আমরা এক সাথে কয়েকটা কাজ ঠিক করে দিতে পারি।

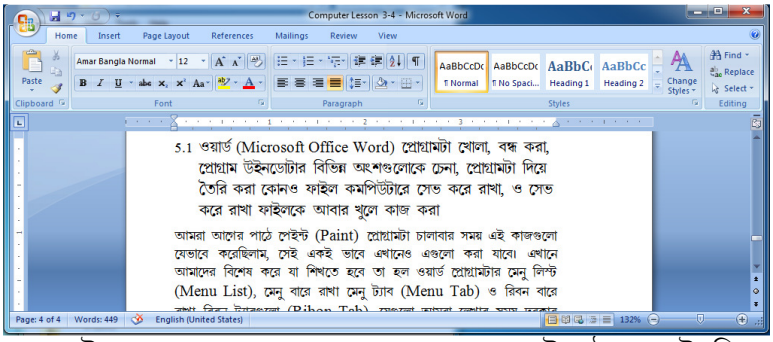

এক একটা মেনুর ওপরে কারসার এনে রাখলে লেখা ফুটে ওঠবে, মেনুটা দিয়ে কী হয়। এগুলোর কোন্‌টা দিয়ে কী কাজ হয় তা ব্যবহার করার সময় ভাল করে বুঝতে পারবে। কোনও কোনও মেনুর পাশে দেখো লিস্ট চিহ্নটা আছে। এটাতে ক্লিক করলে একটা লিস্ট আসে যা সেই মেনুটার বিভিন্ন রকম কাজ করার উপায়গুলো দেখায়। উইনডোটার মাঝে সাদা জায়গাটা হল **Document Area** (ডকুমেন্ট এরিয়া) যা এক একটা পাতা দেখায় ও যেখানে আমরা লেখালিখি করি। এর ওপরে ও বাঁ পাশে আছে রুলার, যা দিয়ে লেখালিখির জায়গাটার পরিমাপ জানা যায়, কতটা চওড়া ও কতটা লম্বা। এই পরিমাপ আমরা ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে করে নিতে পারি মেনু লিস্টের **Document Area** (ডকুমেন্ট এরিয়া) – **Advanced** (অ্যাডভান্সড) এর মধ্যে রাখা **Measurement Units** (মেসারমেন্ট ইউনিটস) থেকে।

এবারে ওপরের রুলারটার দুই ধারে রাখা চিহ্নগুলোতে কারসার নিয়ে রেখে দেখো। লেখা ফুটবে ডান ধারেরটাতে, **Right Indent** (রাইট ইনডেন্ট) আর বাঁ ধারে আছে তিনটে চিহ্ন — একদম নিচেরটা হল **Left Indent** (লেফট ইনডেন্ট), তার ঠিক ওপরেরটা হল **Hanging Indent** (হ্যাঙগিং ইনডেন্ট) আর তার ওপরেরটা হল **First Line Indent** (ফার্স্ট লাইন ইনডেন্ট)। ইনডেন্ট করার অর্থ হল লেখার

লাইনটাকে ডানদিকে থেকে বা বাঁদিক থেকে একটু ভেতর দিকে সরিয়ে রাখা। করে দেখো, কারসারকে এগুলির ওপর রেখে লেফট বাটনটা চেপে ড্র্যাগ করলে রুলারের ওপর এগুলির স্থান সরানো যায়। উইনডোতে ওপরের এই রুলার লাইনটার একদম বাঁ প্রান্তে বা বাঁদিকের রুলারটার ঠিক ওপরে দেখ আরেকটা চিহ্ন রাখা আছে। কারসারকে এটার ওপরে রেখে দেখ এটাতে কী লেখা আছে। এবার এটাতে একবার ক্লিক করো ও কারসারকে সরিয়ে নিয়ে এসে আবার এর ওপরে এনে রাখো। এবার দেখো চিহ্নটা পাল্টে গেছে। এইভাবে পরপর কয়েকবার করে দেখো কী কী আসছে। সাধারণত যেভাবে সাজানো থাকে তা হল, **Left Tab** (লেফট ট্যাব), **Centre Tab** (সেন্টার ট্যাব), **Right Tab** (রাইট ট্যাব), **Decimal Tab** (ডেসিমাল ট্যাব)। এছাড়া ইনডেন্ট করা এখানেও দেখায়। এখানে ক্লিক করে, লেফট, রাইট, সেন্টার বা ডেসিমাল, যেকোনও একটা ট্যাব সিলেক্ট করে রাখো। এবার ওপরের রুলারের কোথাও একটা ক্লিক করো। দেখবে রুলারে ওই ট্যাব চিহ্নটা বসে যাবে। এটাকে সরাবার সহজ উপায় হল, এর ঠিক ওপরে কারসার রেখে মাউসের লেফট বাটনটা চেপে ড্র্যাগ করা, আর এটাকে বাতিল করতে হলে ড্র্যাগ করে রুলারের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই ট্যাবগুলোর অর্থ হলে এক একটা লাইনে লেখার কোনও অংশকে রুলারের ট্যাব-নির্দিষ্ট স্থানটাতে সরানো। এগুলোর ব্যবহার আমরা পরে শিখব।

এবারে দেখো উইনডোটার একদম নিচের বারটা। নিচের এই লম্বা বার অংশটাকে বলে **Status Bar** (স্টেটাস বার) । এটার কোথাও রাইট ক্লিক করলে আমরা একটা লিস্ট পাই, যেখান থেকে আমরা পছন্দ মতো বিষয়টা ব্যবহারে নিতে পারি। এটার সম্বন্ধে আর বিশেষ আপাতত না জানলেও চলবে। স্টেটাস বারটার বাঁ কোনায় দেখাচ্ছে ডকুমেন্টটায় মোট কত পাতা আছে ও এখন তুমি কোন পাতায় কাজ করছ বা কারসারটা রেখেছ তার নম্বর বা **Page Number** (পেজ নাম্বার)। এটাতে ক্লিক করে দেখো, একটা ডায়লগ বক্স আসবে যেখানে তুমি লিখে দিতে পারবে **Go to** (গো টু) যে পাতাটা খুলতে চাও তার নম্বর। এটা অবশ্য হোম মেনুগুচ্ছের **Find** (ফাইন্ড) মেনুটাতেও আছে, আবার কীবোর্ডে **Ctrl+G** টিপলেও আমরা পাবো। এর পাশেই আছে ডকুমেন্টটাতে মোট শব্দ সংখ্যা কত তার হিসেব। এটাতে ক্লিক করলে আমরা একটা মেসেজ বক্সে আরও কিছু তথ্য পাবো। এর পরেরটা দেখায় বানান পরীক্ষক বা **Spell Check** (স্পেল চেক) চালু আছে কিনা। আর দেখানো আছে কোন্ ভাষা বা **Language** (ল্যাঙ্গয়েজ) ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভাষার বাটনটাতে ক্লিক করেও আমরা একটা **Dialog Box** (ডায়লগ বক্স) পাই, যেখানে আমরা ভাষা নির্বাচন করতে

পারি। নিচের স্টেটাস বারটার ডানদিকের অংশটাতে এসো। প্রথমেই পাঁচটা বাটন আছে, যেগুলোতে ক্লিক করে আমরা ডকুমেন্টটাকে বিভিন্নভাবে দেখতে পাবো। সাধারণত আমরা **Print Layout** (প্রিনট লেআউট) ভিউটাই ব্যবহার করি। অন্যগুলো প্রয়োজন হয় বিশেষ কারণে। এরপর আছে আমাদের দেখার সুবিধার জন্য ডিসপ্লে বড় বা ছোট করার ব্যবস্থা। **Zoom** (জুম) স্কেলটাতে ক্লিক করে বা বাটনটাতে কারসার রেখে লেফট বাটন চেপে ড্র্যাগ করে এটা করা যায়।

এবারে দেখো ডানদিকের ভারটিকাল স্ক্রোল বারের নিচে কয়েকটা বাটন আছে। এগুলি হল, **Previous Page** (প্রিভিয়াস পেজ) বা আগের পাতায় ও **Next Page** (নেক্সট পেজ) বা পরের পাতায় যাওয়া, যা আমরা কীইবোর্ড দিয়েও করতে পারি। এই দুটোর মাঝে আছে **Browse** (ব্রাউস) বাটন, যা দিয়ে আমরা ডকুমেন্টটাতে নির্দিষ্ট কোনও কিছু বিষয়গুলিকে দেখতে পেতে পারি। ভারটিকাল স্ক্রোল বারটার একদম ওপরের অংশে আছে আরও দুটো বাটন। নিচ থেকে প্রথমটা হল **View Ruler** (ভিউ রুলার) যেটা ক্লিক করে রুলার অন বা অফ করা যায়। এর ওপরেই আছে ডকুমেন্ট অংশটাকে দুভাগে **Split** (স্প্লিট) করে দেখানোর বাটন। এটা ডাবল ক্লিক করলে বা ড্র্যাগ করে নিচে আনলে আমরা একই ডকুমেন্টকে ওপরে-নিচে দুটো অংশে দেখতে পাই ও এক একটা অংশে স্ক্রোল করে দেখতে ও কাজ করতে পারি। এর সুবিধা হল খুব বড় ডকুমেন্টের সামনের একটা অংশ আর পিছনের অন্য অংশে কী আছে দেখা ও কাজ করা। এটাকে বন্ধ করে আবার একটা অংশে ফিরে যাওয়ার উপায় হল, নিচের অংশটার রুলার লাইনটার ওপর প্রান্তে কারসার রাখলে ওই স্প্লিট চিহ্নটা দেখাবে। এটা ডাবল ক্লিক অথবা ড্র্যাগ করে ওপরে তুলে নিয়ে গেলেই এই দুভাগটা চলে যাবে। ওপরের ডানদিকের কোনায় একটা **Help** (হেলপ) বাটন আছে। এটাতে ক্লিক করে আমরা ইনটারনেট **Online** (অনলাইন) থাকলে অনলাইন হেলপ পাব, আর তা না থাকলে **Offline** (অফলাইন) হেলপ পাব, ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে। আমরা ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার উইনডোতে কী কী আছে তা মোটামুটি দেখলাম। কাজে প্রয়োগ করতে করতেই এগুলির সঠিক অর্থ ও ব্যবহার রপ্ত হবে।

4.2 কীভাবে টাইপ করে লেখা হয়

4.2.1 **Insertion Point** (ইনসারশন পয়েন্ট)

ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা চালু করলে লেখালিখির জন্য যে ডকুমেন্ট এরিয়াটা আমরা পাই তার একদম ওপরে বাঁদিকের কোনায় থাকে ওয়ার্ডে কারসারটা, একটা কালো দাঁড়ি মতো

জ্বলছে নিবছে। এটা হল ওয়ার্ডের **Blinking Cursor** (ব্লিংকিং কারসার)। এর মানে হল, আমরা এই জায়গা থেকে লিখতে শুরু করতে পারব, বা এটা দেখায় **Insertion Point** (ইনসারশন পয়েন্ট)। লক্ষ করো, কারসারটার টাইপ করা বর্ণ বা ক্যারেকটারটার ঠিক বাঁয়ে বসছে—লেখা যেমন যেমন একটা লাইন ধরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এগোবে, কারসারটাও তার শেষে এসে অবস্থান করবে।

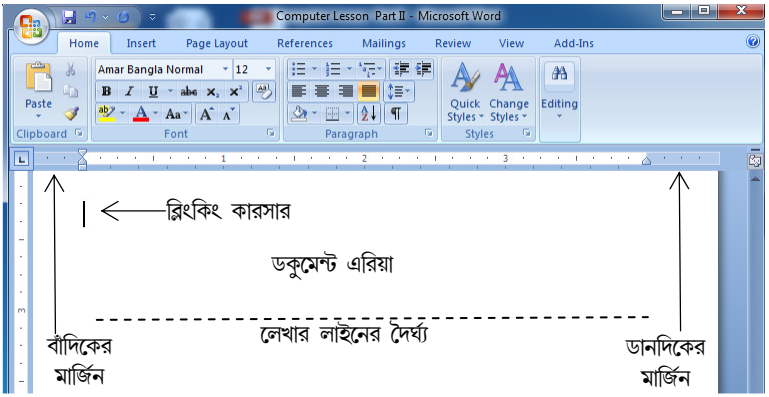

এবারে দেখো, ডকুমেন্ট এরিয়া একটা পাতাকে দেখাচ্ছে, যার বাঁদিকে ও ডানদিকে মার্জিন অংশ রাখা আছে। এই মার্জিন অংশ বাদ দিয়ে আমরা পাচ্ছি এক একটা লেখার লাইন কতদূর যেতে পারে। এটা আমরা ওপরের রুলার থেকে দেখতে পাই। একটা লাইন টাইপ করে দেখো যে লাইনটা পুরো হলে কারসার আপনি পরের লাইনে চলে যাচ্ছে। সুতরাং, এইভাবে টানা টাইপ করে যেতে হবে। এক একটা লাইন সম্পূর্ণ হলে পরের লাইন আপনি চলে আসবে। একটা লাইনে খানিকটা লেখার পর **Enter** (এন্টার) টিপলে আমরা পরের লাইনে চলে যাই । এটা দরকার হয় পরের **Paragraph** (প্যারাগ্রাফ) লেখা শুরু করতে, অথবা কোনও বিশেষ দরকারে পাতার মাঝে কয়েক লাইন বা অনেকটা জায়গা ছেড়ে রাখতে। একটা পাতায় কয়েক লাইন লিখে (বা না-লিখে) তুমি যদি পরের পাতায় লেখা শুরু করতে চাও, তাহলে **Ctrl+Enter** (সিটিআরএল+এন্টার) টিপলে পরের পাতায় চলে যাবে। এছাড়া এন্টার কীইয়ের ব্যবহার লেখার জন্য প্রয়োজন হবে না।

টাইপ করে টানা লেখার সময় এক একটা শব্দের মাঝে একটা করে স্পেস ছাড়তে হয়। একটা করে স্পেস ছাড়ার কাজটা সর্বদা করবে **Spacebar** (স্পেসবার) একবার

টিপে। কোনও কারণে একটা বেশি স্পেস দিতে হলে **Tab** (ট্যাব) ব্যবহার করা উচিত। যেমন, প্যারাগ্রাফ লেখার শুরুতে তিনটি বা পাঁচটি স্পেস দিতে হয়। এটা করা উচিত ট্যাব টিপে। একবার ট্যাব টিপলে কতটা ডাইনে সরবে সেটা আমরা ঠিকে করে দিতে পারি, যা পরে আলোচনা করা হবে। প্যারাগ্রাফ শুরু করা ছাড়াও, কখনো প্রয়োজন হয় পর পর কয়েক লাইনে কিছু শব্দকে সারিতে সাজিয়ে লেখা — যেমন,

সারিগুলো	কখনোই	স্পেসবার দিয়ে	পর পর লাইনে সমান করে আনা
যায় না।	এখানে তাই	ট্যাব ব্যবহার	করতে হয়।

এইকাজটা অবশ্য আমরা রুলারে **Tab Set** (ট্যাব সেট) নির্দিষ্ট করে বসিয়ে বা **Tables** (টেবলস) দিয়েও করতে পারি, যা পরে শিখব।

লেখা টাইপ করে একটা পাতা পুরো হয়ে গেলে পরের লাইনটা পরের পাতাতেও আপনি চলে যাবে। এন্টার টেপা দরকার হবে না। এইভাবে আমরা অনেক পাতার ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি। লক্ষ করো, ওয়ার্ড পাতার সংখ্যা গুনে পাতার নম্বর আপনি দেখাবে উইনডোর নিচে বাঁদিকের কোনায়, যদিও এই পাতার নম্বর ডকুমেন্টের মধ্যে লিখিত থাকবে না । চাইলে আমরা তাও করতে পারব, **Insert Page Number** (ইনসার্ট পেজ নাম্বার) দিয়ে, যা পরে শিখব।

4.2.2 **Move Around** (মুভ অ্যারাউন্ড)

এবার দেখা যাক বেশ কয়েক পাতার একটা ডকুমেন্টের বিভিন্ন জায়গা আমরা কী করে দেখতে পারি বা Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড) করতে পারি ও দরকার মতো কোনও জায়গায় লেখাটা পাল্টাতে পারি। এই কাজটা দুভাবেই করা যাবে কীবোর্ড দিয়ে অথবা মাউস দিয়ে।

কীবোর্ড দিয়ে— Blinking Cursor -টা কোথায় আছে দেখে রাখো। এবার কারসার কীইগুলো একবার একবার করে টিপে দেখো কারসারটা কোথায় সরছে। এভাবে আমরা যেকোনও একটা পাতার কোনও প্যারাগ্রফের মধ্যে ব্লিংকিং কারসারকে সরাতে পারি।

কীই টিপে দেখো	ব্লিংকিং কারসার সরবে
→	ডানদিকে একটা ক্যারেকটার
←	বাঁদিকে একটা ক্যারেকটার
↓	নিচের লাইনে
↑	ওপরের লাইনে

কিন্তু চট করে পরের প্যারাগ্রাফ বা অন্য পাতায় যাব কী করে? এর জন্য আরও কয়েকটা উপায় নিচে দেওয়া হল। এগুলি ব্যবহার করে দেখে নিতে হবে।

কীই টিপে দেখো	ব্লিংকিং কারসার সরবে
PageUp	আগের স্ক্রিনে
PageDown	পরের স্ক্রিনে
Home	যে লাইনটাতে আছে তার প্রথমে
End	যে লাইনটাতে আছে তার শেষে
Ctrl + →	ঠিক পরের শব্দে
Ctrl + ←	ঠিক আগের শব্দে
Ctrl + ↓	পরের প্যারাগ্রাফের প্রথমে
Ctrl + ↑	আগের প্যারাগ্রাফের প্রথমে
Ctrl + PageUp	আগের পাতার প্রথমে
Ctrl + PageDown	পরের পাতার প্রথমে
Ctrl + Home	ডকুমেন্টের প্রথমে
Ctrl + End	ডকুমেন্টের শেষে
Shift + F5	ঠিক আগে যেখানে কাজ করা হয়েছিল
Ctrl +G	যে পাতার নম্বর বলে দেওয়া হবে

মাউস দিয়ে — মুভ অ্যারাউন্ড কাজটা আরও সহজে করা যাবে। কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। লক্ষ করো, ব্লিংকিং কারসার হল ওয়ার্ডের লেখার ইনসারশন পয়েন্ট। সেটা ছাড়াও মাউস আরেকটা কারসার দেখাচ্ছে। লেখার ওপরে এটা ইংরেজির বড় হাতে I-এর মতো। মাউস সরালে লেখা অংশের ওপর এটাও সরে। কিন্তু ব্লিংকিং কারসারটা সরে না। আবার বাঁদিকের মার্জিন অংশে এলে এই **Mouse Cursor** (মাউস কারসার)-টা পাল্টে গিয়ে ডানদিকমুখি তির চিহ্ন হয়ে যায়। এই তির চিহ্নটা হয় লেখার লাইনকে সিলেক্ট করার জন্য। এর কথায় পরে আসব।

মাউস কারসারকে লেখা অংশের যেকোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে একবার ক্লিক করো। দেখো, ব্লিংকিং কারসারটা ওখানে এসে গেছে, অর্থাৎ, এখন তুমি এখানে **Insert** (ইনসার্ট) করতে পারো বা টাইপ করতে পারো। এবার পরের বা আগের যেকোনও পাতায় যাওয়া। মাউসের **Scroll Button** (স্ক্রোল বাটন) দিয়ে এটা করে দেখো। অথবা করে দেখো, ডানদিকের ভারটিকাল স্ক্রোল বারের ওপরে ও নিচে তির চিহ্নে ক্লিক করলে স্ক্রিনে এক একবারে ওপরে বা নিচে একটা করে লাইন উঠবে বা নামবে। চট করে বেশ কয়েক পাতা আগে বা পরে যেতে ভারটিকাল স্ক্রোল বারে ক্লিক করে বা

বারটাকে ওপরে-নিচে ড্র্যাগ করে দেখো। প্রয়োজন মতো জায়গায় মাউস কারসারটা একবার ক্লিক করো, ব্লিংকিং কারসারটা ওখানে এসে যাবে।

বিশেষ করে মনে রেখো যে এভাবে মাউস দিয়ে স্ক্রোল করলে কিন্তু শুধু স্ক্রিনে দেখানো জায়গাটা পাল্টায়, ব্লিংকিং কারসারটা সরে না। ওটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়, যতক্ষণ না তুমি স্ক্রিনে দেখানো কোনও জায়গাতে মাউস কারসারটাকে রেখে একবার ক্লিক করছ।

4.2.3 **Delete Text (**ডিলিট টেক্সট)

লেখার সময় ভুল হবেই, যা লেখার পরে দেখা যাবে ও তখন তা কেটে মুছে দিতে হবে। এটা করতে আমাদের কীবোর্ডের বিশেষ দুটো কীই কাজে আসবে, **Delete Key** (ডিলিট কীই) আর **Backspace Key** (ব্যাকস্পেস কীই)।

মনে রাখো: ব্যাকস্পেস কীই কাটে ব্লিংকিং কারসারের বা ইনসারশন পয়েন্টের বাঁদিকের আর ডিলিট কীই কাটে ডানদিকের এক একবারে একটা করে ক্যারেকটার বা স্পেস।

সুতরাং, কোন্ কীইটা ব্যবহার করবে সেটা নির্ভর করবে তুমি ব্লিংকিং কারসারের কোনদিকের লেখা কাটতে চাইছ তার ওপরে। এই দুইভাবে কাটা কয়েকবার ব্যবহার করে দেখে নাও। কিন্তু একটা লাইনে লেখা একটা বা একাধিক শব্দ একবারে কেটে মুছে দিতে হলে তো আরও কোনও সহজ উপায় চাই। সেগুলো নিচে বলা হল।

কীই টিপে দেখো	ব্লিংকিং কারসার থেকে কাটবে
Ctrl + Backspace	বাঁদিকে পুরো একটা করে শব্দ
Ctrl + Delete	ডানদিকে পুরো একটা করে শব্দ

একবারে লেখার অনেকটা অংশ কাটতে গেলে আমাদের আগে সেই অংশটা নির্দিষ্ট বা সিলেক্ট করে নিতে হবে ও তারপর ডিলিট কীই অথবা ব্যাকস্পেস কীই, যেকোনও একটা টিপলেই সিলেক্ট করা অংশটা কেটে যাবে। সুতরাং আমাদের শিখতে হবে ওয়ার্ডের লেখা অংশ থেকে আমরা প্রয়োজন মতো অংশ কীভাবে সিলেক্ট করতে পারি।

4.2.4 **Selection** (সিলেকশন)

বিভিন্ন পদ্ধতিতে লেখার অংশ সিলেক্ট করে নেওয়া যায় । লক্ষ করো, সিলেক্ট করা হলে অংশটা **Highlight** (হাইলাইট) হয়ে যায়। **Highlight** (হাইলাইট) সিলেকশনটা থাকে না মাউস লেফট ক্লিক করলে বা কীবোর্ডের কারসার কীই টিপলে। কিন্তু অন্য কোনও ক্যারেকটার বা স্পেস বার টিপলে ওই সিলেক্ট করা অংশটা ডিলিট হয়ে সেই ক্যারেকটারটা বা স্পেস টাইপ হয়ে যায়। কী কী পদ্ধতি সিলেকশন করা যায় এখানে তার একটা তালিকা দেওয়া হল।

Mouse Drag	ডকুমেন্টের কোনও একটা জায়গায় ক্লিক করে ব্লিংকিং কারসারটা রাখো, ও তারপর মাউসের লেফট বাটনটা চেপে রেখে মাউসকে সরাও, ডাইনে বাঁয়ে বা ওপরে নিচে। যেখানটাতে গিয়ে লেফট বাটনটা ছাড়বে সেই পর্যন্ত সিলেক্ট হবে। এভাবে ডকুমেন্টের যেকোনও অংশ সিলেক্ট করা যায়।
Shift+ Mouse Click	লেফট বাটন চেপে মাউস ড্র্যাগ করার পরিবর্তে Shift চেপে ক্লিক করেও এটা করা যায়। যে অংশটা সিলেক্ট করতে চাও তার আরম্ভে (বা শেষে) ব্লিংকিং কারসারটা রাখো মাউস ক্লিক করে। এবার অংশটার শেষে (বা আরম্ভে) মাউস কারসার নিয়ে গিয়ে Shift চেপে মাউস ক্লিক করো।
Shift+Cursor Key	Shift চেপে কারসার কীই দিয়েও সিলেকশন করা যাবে, ব্লিংকিং কারসারের ডাইনে, বাঁয়ে, ওপর বা নিচের লাইনে।
Shift+PageUp	Shift চেপে রেখে PageUp টিপে আমরা ব্লিংকিং কারসারের ওপরের অংশ সিলেক্ট করতে পারি।
Shift+PageDown	Shift চেপে রেখে PageDown টিপে আমরা ব্লিংকিং কারসারের নিচের অংশ সিলেক্ট করতে পারি।
Ctrl+ Mouse Drag	বিভিন্ন ছাড়া ছাড়া অংশ সিলেক্ট করা যাবে, Ctrl চেপে অংশগুলির ওপর মাউসের লেফট বাটন চেপে মাউস সরালে।
Ctrl+ Mouse Click	পুরো একটা বাক্য সিলেক্ট করা যাবে।
Double Click	কোনও শব্দের ওপর মাউস ডাবল ক্লিক করলে শব্দটা সিলেক্ট করা যাবে।
Tripple Click	কোনও প্যারাগ্রাফে তিনবার ক্লিক করলে পুরো প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট করা হয়ে যাবে।
F8 then Cursor key	চেপে রাখার বদলে F8একবার টিপে নিলে কারসার কীই ও পেজ-আপ, পেজ-ডাউন কীইগুলো দিয়ে সিলেক্ট করা যাবে। Esc কীই টিপলে F8 সিলেকশন মোড চলে যাবে।
Click on Left Margin Selection Bar	একটা লাইন ও বাটন চেপে রেখে মাউস ওপরে-নিচে ড্র্যাগ করলে একাধিক লাইন সিলেক্ট করা যাবে।
Double Click on Left Margin Selection Bar	পুরো প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট করা হয়ে যাবে।
Alt+Mouse Drag বা Ctrl+Shift+F8 Then use Cursor Key	ডকুমেন্ট স্ক্রিনে কোনও কলাম বা সারিতে লেখা অংশ সিলেক্ট করা ।
Ctrl+A	পুরো ডকুমেন্ট সিলেক্ট করা । রিবনে হোম মেনুগুচ্ছের ডান পাশে রাখা **Select All** (সিলেক্ট অল্) মেনু দিয়েও হয়।

4.2.5 **Undo** (আনডু), **Redo** (রিডু), ও **Repeat** (রিপিট)

ভুল করে কিছু টাইপ করে লেখা বা কাটার সময়, অথবা কোনও কিছু ইনসারট বা কেটে দেওয়ার পর দরকার হতেই পারে ওটা না করা। অর্থাৎ, যা করা হয়েছে সেটা বাতিল করা। এর জন্য কুইক অ্যাক্সেস টুলবারের **Undo** (আনডু) ক্লিক করতে হয়। আবার হয়ত ভুল করে যেটা আনডু করা হল সেটাকে ফেরৎ আনা দরকার হবে। তার জন্য আছে **Redo** (রিডু)। এগুলো ডকুমেন্ট ফাইলে লেখার সময় কাজে লাগে।

বিশেষ কাজে লাগে ওয়ার্ডে **F4** (এফ ফোর) কীইটা। এটা দিয়ে আমরা পাই **Repeat Last Action** (রিপিট লাস্ট অ্যাকশন)। মনে করো লেখার অনেক জায়গায় কমা চিহ্নটা বসাতে হবে। প্রথমে একটা জায়গায় কমা টাইপ করে নিয়ে এক এক করে পরের জায়গাগুলোতে ব্লিংকিং কারসার নিয়ে যাও ও F4 টেপো। কমা চিহ্নটা বসে যাবে, বারবার কমা টাইপ করতে হবে না।

4.3 **Editing Text** (এডিটিং টেক্সট) ও **Formatting Text** (ফরম্যাটিং টেক্সট)— লেখার ভুল শুদ্ধ ও হরফ পরিবর্তন করা

Editing Text (এডিটিং টেক্সট)

লেখালেখি সম্পূর্ণ করার পর অথবা মাঝেমধ্যেই লেখায় ভুল সংশোধন করা, বা লেখাটার কিছু পরিবর্তন করার দরকার হবে। ভুল সংশোধন করতে আমাদের কী কী করা দরকার হতে পারে —

1. ভুলগুলো কেটে বাদ দেওয়া বা ডিলিট করা,
2. লেখার মাঝে নতুন কিছু লিখে ঢোকানো বা ইনসার্ট করা,
3. লেখার কোনও অংশের বদলে নতুন কিছু লেখা বা ওভারটাইপ,
4. লেখার বিভিন্ন অংশকে আগে পরে করা,
5. কোনও বিশেষ শব্দ লেখা হয়েছে কিনা খুঁজে দেখা ও প্রয়োজন মতো তার বদলে অন্য শব্দ বসানো, ও
6. শব্দের বানান ও বাক্যের গঠন ঠিক আছে কিনা দেখা ।

4.3.1 **Delete Text (ডিলিট টেক্সট)**

ভুলগুলো কেটে বাদ দেওয়া বা ডিলিট করার বিভিন্ন উপায় আমরা আগের পাঠেই শিখে নিয়েছি। এখানে এটা আলোচনা তাই দরকার নেই ।

4.3.2 **Insert Text** (ইনসার্ট টেক্সট)

আগেই লক্ষ করেছ যে ওয়ার্ডে টাইপ করার সময় লেখাটা সর্বদাই ব্লিংকিং কারসার বা ইনসারশন পয়েন্টের বাঁদিকে বসে, ও যেমন যেমন লেখা টাইপ হয় ব্লিংকিং কারসারটা তার শেষে (ডাইনে) এসে অবস্থান করে। ওই জায়গাতে যা লেখা ছিল তা কিন্তু কাটে না, শুধু ডান দিকে আপনি সরে এই ইনসারশনের জায়গা করে দেয়। ওয়ার্ডে **Insertion Mode** (ইনসারশন মোড) করা থাকলে এটা হয়। সুতরাং কোথাও আরও কিছু লিখে ঢোকাতে গেলে আমাদের আগে ব্লিংকিং কারসারকে ঠিক সেইখানে নিয়ে যেতে হবে।

4.3.3 **Overtype Text** (ওভারটাইপ টেক্সট)

যদি আমাদের এটা প্রয়োজন হয় যে কোনও অংশের লেখার বদলে নতুন কিছু টাইপ করে লেখা। অর্থাৎ আগের লেখা কেটে তার জায়গায় নতুন লেখা টাইপ করা, তাহলে সেটাকে বলা হবে **Overtype** (ওভারটাইপ)। এটা করতে গেলে ওয়ার্ডে **Overtype Mode** (ওভারটাইপ মোড) করে রাখতে হবে। ওয়ার্ড উইনডোর নিচের **Status Bar** (স্টেটাস বার) খুঁজে দেখো ইনসারশন অথবা ওভারটাইপ মোড দেখানো আছে কিনা। না থাকলে স্টেটাস বারে রাইট ক্লিক করলে একটা লিসট আসবে ও সেখানে ওভারটাইপ আইটেমটা ক্লিক করে নিতে হবে। যে বাটনটা আসবে সেটা **Toggle** (টগ্‌ল্‌) বাটন, মানে একবার ক্লিক করলে ইনসার্ট আর পরের বার ক্লিক করলে ওভারটাইপ মোড হবে।

4.3.4 **Copy** (কপি) **Paste** (পেস্ট) ও **Cut** (কাট) **Paste** (পেস্ট)

এই পুস্তিকার প্রথম ভাগে ফাইল ও ফোল্ডার ঠিকভাবে সাজিয়ে রাখার আলোচনার সময় কপি-পেস্ট ও কাট-পেস্ট বুঝিয়ে বলা হয়েছে। মনে না থাকলে সেটা আবার দেখে নাও। এছাড়া এখানে আগের পাঠেই আলোচনা করা হয়েছে ওয়ার্ড ডকুমেন্টের কোনও অংশ কী কী উপায়ে সিলেক্ট করা যায়।

নির্বাচিত বা সিলেক্ট করা অংশ কপি করে অন্য কোথায় পেস্ট করলে সেখানেও সিলেক্ট করা অংশটি এসে যায় ও সেটি যেখানে ছিল সেখানেও থেকে যায়। কাট করে পেস্ট করলে সিলেক্ট করা অংশটি কিন্তু আর সেখানে থাকে না, মুছে যায়। যেখানে পেস্ট করা হল শুধু সেখানেই সেটা চলে আসে। অর্থাৎ, কাট-পেস্ট করে আমরা সিলেক্ট করা অংশটাকে সরাতে পারি, যাকে **Move** (মুভ) করা বলা হয়। মনে রেখো, কপি বা কাট করে আমরা সিলেক্ট করা অংশটাকে **Clipboard** (ক্লিপবোর্ড) বা কমপিউটারের

Memory (মেমরি)-তে রাখি। তাই যতক্ষণ না আবার অন্য কোনও কিছু ক্লিপবোর্ডে রাখা হচ্ছে কপি বা কাট করে, আগেরটা থেকেই যায় ও বার বার পেস্ট করা যায়, এমনকি ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা বন্ধ করে দিলেও ওটা মেমরিতে থেকে যাবে ও আবার পেস্ট করা যাবে অন্য কোথাও।

ডকুমেন্টের সিলেক্ট করা অংশটি কোথাও কপি-পেস্ট বা কাট-পেস্ট করার তিনটে উপায় আছে — প্রোগ্রামের মেনু ব্যবহার করে, মাউস ব্যবহার করে, অথবা কীবোর্ড ব্যবহার করে।

প্রোগ্রামের মেনু ব্যবহার করে—আগে যে অংশটা কপি বা কাট করতে হবে সেটা সিলেক্ট করো। এবার মেনুবারে হোম মেনু ট্যাবের রিবনের বাঁদিকে দেখো Clipboard (ক্লিপবোর্ড) গ্রুপটা। ওখানে পাবে **Copy**, **Cut**, ও **Paste Icon** (আইকন) বা চিহ্নগুলো। কপি করবে না কাট করবে সেই অনুযায়ী আইকনটাতে ক্লিক করো। এরপর যেখানে পেস্ট করতে চাও, সেইখানে ব্লিংকিং কারসারকে নিয়ে রাখো ও এবার মেনুর পেস্ট আইকনটা ক্লিক করো।

মাউস ব্যবহার করে— সিলেক্ট করা অংশে মাউস কারসার রেখে রাইট ক্লিক করো। যে লিস্টটা আসবে তার কপি বা কাট আইটেমটা ক্লিক করে নাও। এবার যেখানে পেস্ট করতে চাও সেখানে মাউস কারসার নিয়ে গিয়ে একবার লেফট ক্লিক করো। ব্লিংকিং কারসার বা ইনসারশন পয়েন্টটা এখানে দেখাবে ও এবার রাইট ক্লিক করো। সেই একই লিস্ট আসবে যার পেস্ট আইটেমটা লেফট ক্লিক করলে পেস্ট হয়ে যাবে।

কীবোর্ড ব্যবহার করে — একই ভাবে হবে, শুধু কপি করতে **Ctrl+C**, কাট করতে **Ctrl+X**, আর পেস্ট করতে **Ctrl+V** ব্যবহার করতে হবে। তিনটির যেকোনও একটি পদ্ধতি, বা মিলিয়ে-মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে, যেটা সুবিধা।

4.3.5 Find (ফাইন্ড) ও Replace (রিপ্লেস)

অনেক সময় ডকুমেন্টের লেখাতে কোনও বিশেষ একটি শব্দ বা শব্দ-বন্ধ (দু-তিনটে পর পর শব্দ) বা কোনও চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে কিনা খুঁজে দেখতে **Find (ফাইন্ড)** এবং তার বদলে অন্য কিছু লেখার প্রয়োজন হতে পারে, যাকে বলে **Replace (রিপ্লেস)**। মনে করো তুমি দেখতে চাও কোনও লেখাতে কোথায় কোথায় **have been** শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হোম মেনু ট্যাবের রিবনের এডিটিং মেনু গ্রুপের **Find** (ফাইন্ড) মেনুটা দিয়ে করা যাবে। ডকুমেন্টটার যেকোনও জায়গা (মানে যেখানে ব্লিংকিং কারসারটা আছে) থেকেই কাজটা শুরু করা যায়।

ফাইন্ড মেনুটা ক্লিক করলে অথবা **Alt+F** (অল্ট এফ) টিপলে একটা **Dialogue Box** (ডায়লগ বক্স) আসবে, যেখানে শব্দ দুটো ঠিক ঠিক লিখতে হবে। এবারে এক এক বার **Find Next** (ফাইন্ড নেক্সট) বাটনটায় ক্লিক করে যেখানে যেখানে শব্দদুটো আছে সেটা এক এক করে দেখতে পাবে ও চাইলে তুমি এক একটা জায়গায় বা তার আগে পরে কিছু টাইপও করতে পারবে, ও তারপর আবার খোঁজা বা ফাইন্ড কাজটা চালিয়ে যেতে পারবে ফাইন্ড নেক্সট বাটনটায় ক্লিক করে। ডকুমেন্টের শেষে পৌঁছে গেলে আবার একটা ডায়লগ বক্স আসবে, ডকুমেন্টটার প্রথম থেকে তুমি দেখতে চাও কিনা সেটা বলার জন্য।

আবার মনে করো, his (হিস) শব্দটাকে পাল্টে her (হার) করতে হবে। ফাইন্ড মেনুতে ক্লিক করে ডায়লগ বক্সটার রিপ্লেস ট্যাবটা ক্লিক করে নাও, অথবা প্রথমেই রিপ্লেস মেনুটাই ক্লিক করো নাও। ডায়লগ বক্সে ফাইন্ড-এর জায়গায় his লেখো ও রিপ্লেস-এর জায়গায় her লেখো । এটা সাবধানে করা উচিত, যাতে ভুল লেখা যেন না হয়।

এক একবারে একটা করে শব্দ পাল্টাতে ফাইন্ড নেক্সট বাটনটা ক্লিক করে শব্দটা আগে দেখে নাও ও পাল্টাতে হলে তারপর রিপ্লেস বাটনটা ক্লিক করো। না দেখে সবগুলো যদি একবারে পাল্টাতে চাও তো **Replace All** (রিপ্লেস অল্ বাটনটা) ক্লিক করো। কিন্তু এখানে এটা করা হয়তো ঠিক হবেনা, কারণ **this** শব্দটার মধ্যেও তো **his** আছে। তাই, ওই **this** গুলোও যে **ther** হয়ে যাবে। এর উপায় হল ডায়লগ বক্সের **More** (মোর) বাটনটা ক্লিক করে **Search Options** (সার্চ অপ্শনস) গুলো পাবে, যেখানে **Find whole words only** (ফাইন্ড হোল ওয়ার্ডস ওন্লি) অপ্শনটার পাশের **Check Box** (চেক বক্স) ক্লিক করে টিক দিয়ে নিতে হবে। তাহলে আর এই সমস্যাটা হবে না। সার্চ অপ্শনের মধ্যে আরও কয়েকটা ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে, যেগুলো পরে দরকার মতো শিখে নেওয়া যাবে। যেমন **Match case** (ম্যাচ কেস) দরকার হবে যদি আমরা চাই বাক্যের আরম্ভে **This**-কে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের মাঝের **this**-গুলোকে **that** করে দিতে। মনে রেখো, একান্ত নিশ্চিত না হয়ে রিপ্লেস অল্ ব্যবহার না করাই ভাল। ফাইন্ড রিপ্লেস কাজটা আমরা শুধুমাত্র সিলেক্ট করা অংশেও করতে পারি। সেখানে রিপ্লেস অল্ করলে কোনও ভুল হলেও বড় দুর্ঘটনা ঘটে না। সিলেক্ট করা অংশে কাজটা হয়ে যাওয়ার পরে ডায়লগ বক্স পাবে বাকি অংশে করতে চাও কিনা সেটা বলে দিতে।

4.3.6 **Spell Check** (স্পেল চেক) ও **Grammar Check** (গ্রামার চেক)

ওয়ার্ড প্রোগ্রামে স্পেল চেক ও গ্রামার চেক আপনা থেকেই চালু হয়ে থাকে। কোনও শব্দের বানান, প্রোগ্রামটাতে রাখা ইংরেজি **Dictionary** (ডিক্শনারি) বা অভিধান অনুযায়ী ভুল বা অভিধানে না থাকলে, শব্দটার তলায় লাল রঙের রেখা দেখাবে। প্রোগ্রামে রেখে দেওয়া গ্রামার বা ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের গঠন ঠিক না হলে পুরো বাক্যটি বা তার ভুল অংশটির নিচে সবুজ রঙের রেখা দেখাবে। এটা শুধু স্ক্রিনেই দেখায়। **Print** (প্রিন্ট) করা হলে এই রেখাগুলো প্রিন্ট হয়না।

স্পেল চেক ও গ্রামার চেক বন্ধ করতে চাইলে স্টেটাস বারে **Language** (ল্যাঙ্গয়েজ) বাটন অথবা **Review Menu** (রিভিউ মেনু) ট্যাবের রিবনে **Proofing** (প্রুফিং) গ্রুপে **Set language** (সেট ল্যাঙ্গয়েজ) মেনুটা ক্লিক করতে হবে, ও ডায়লগ বক্সে **Do not check spelling or grammar** (ডু নট চেক স্পেলিং ওর গ্রামার) চেক বক্সে ক্লিক করে টিক দিতে হবে। এখানেই যেগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন্ ল্যাঙ্গয়েজটা চাও বলে দিতে পারবে।

রিভিউ মেনু ট্যাবের রিবনে Proofing (প্রুফিং) গ্রুপের **Spelling & Grammar** (স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার) মেনুটা ক্লিক করে তুমি কোনও সিলেক্ট করা অংশ বা পুরো ডকুমেন্টার স্পেলিং ও গ্রামার চেক করতে পারবে। চেক করার সময় একটা ডায়লগ বক্স খুলবে। যে শব্দগুলোর বানান ভুল বা পায়নি সেগুলো লাল রঙে দেখাবে ও ডকুমেন্টে একটা একটা করে হাইলাইট করা থাকবে। তুমি চাইলে সেগুলো ডকুমেন্টে টাইপ করে ঠিক করতে পারো, অথবা **Ignore** (ইগ্নোর ওয়ান্স), **Ignore all** (ইগ্নোর অল) বা **Add to Dictionary** (অ্যাড টু ডিকশনারি) করতে পারো। গ্রামার চেক অপ্শনটা টিক দেওয়া থাকলে ডায়লগ বক্সে এক একটা করে সেই বাক্যগুলো দেখাবে যেগুলো প্রোগ্রামের নিজস্ব গ্রামার অনুযায়ী ঠিক নয়, ও সম্ভব হলে একটা বিকল্প বাক্য **Suggetion** (সাজেশন) হিসাবে দেবে। চাইলে এই বিকল্প বাক্যটাকে নিতে পারো **Change** (চেন্জ) ক্লিক করে। মনে রেখো, এই সাজেশনের বিকল্প বাক্যটা সর্বদা ঠিক হয়না ও বাক্যের মানেটাও পালটে যেতে পারে, বিশেষত বড় জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে।

Formatting Text (ফরম্যাটিং টেক্সট)

টেক্সট ফরম্যাটিং করার সময় আমরা দেখে নিই লেখায় যে যে হরফ ব্যবহার করা হয়েছে তা পছন্দসই কিনা ও লেখার সর্বত্র ঠিক আছে কিনা। এটা করা উপায় হল **Home Menu** (হোম মেনু) ট্যাবের রিবনে রাখা **Font** (ফন্ট) গ্রুপটার মেনুগুলো,

অথবা ফন্ট লেখা রিবন গ্রুপটার ডানপাশে রাখা লিস্ট বাটনটা ক্লিক করে **Font Dialogue Box** (ফন্ট ডায়লগ বক্স) খুলে সেখানে কোন্‌টা কোন্‌টা চাই বলে দেওয়া। টেক্সট ফরম্যাট করার সময় আমাদের যে অংশটা ফরম্যাট করতে বা পাল্টাতে চাই সেটা আগে সিলেক্ট করে নিতে হয়। পুরো ডকুমেন্টের লেখা হরফগুলো ওই একভাবে পাল্টাতে হলে আগে পুরো ডকুমেন্টাই সিলেক্ট করতে হবে।

4.3.7 **Font** (ফন্ট), **Font Size** (ফন্ট সাইজ) ও **Font Style** (ফন্ট স্টাইল)

লেখায় বিভিন্ন ধরনের হরফ ব্যবহার করা যেতে পারে। হরফের ধরনগুলোকে বলে ফন্ট, ও প্রত্যেকটার এক একটা **Font Name** (ফন্ট নেম) বা নাম আছে। হরফগুলো ছোট বড় নানা আকারে ব্যবহার করা যায়। একে বলে Font Size (ফন্ট সাইজ)। আবার, সাধারণভাবে ব্যবহার করা **Regular Font** (রেগুলার ফন্ট) ছাড়াও তিনটে রকমের কায়দা বা **Font Style** (ফন্ট স্টাইল) করা যায় — **Bold** (বোল্ড), ***Italics*** (আইটালিক্‌স) ও **Underline** (আন্ডারলাইন)। এই স্টাইলগুলো একই হরফ বা শব্দে ***একসাথেও*** প্রয়োগ করা যায়।

হোম মেনু ট্যাবের রিবনে রাখা ফন্ট গ্রুপটার মেনুগুলো দেখ। ওপরেই আছে ফন্টের নাম লেখা একটা জায়গা ও তার পাশে একটা লিস্ট বাটন। লিস্ট বাটনটা ক্লিক করলে কমপিউটারে যতগুলো ফন্ট আছে তার লিস্টটা খুলবে। এর থেকে যেটা তুমি ক্লিক করবে সেই ফন্টটা নির্বাচিত হয়ে যাবে তোমার লেখার জন্য, ও সেটার নাম ফন্টের নামের জায়গাটাতে দেখাবে। এর পাশে আছে ফন্ট সাইজ। এটাও তুমি একই ভাবে ঠিক করে নিতে পারবে।

লেখা শুরু করার সময় প্রথমেই ফন্ট ও ফন্ট সাইজটা ঠিক করে নেওয়া ভাল। মনে রেখো, কোনও একটা লেখায় একাধিক ফন্ট ব্যবহার খুব একটা ভাল দেখায় না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সেটা না করাই ভাল। লেখার জায়গায় জায়গায় প্রয়োজন মতো স্টাইল আমরা লেখার সময় বা পরেও করে নিতে পারি।

রিবনের এই মেনু গ্রুপটাতে নিচের অংশে আছে এক একটা স্টাইল নেওয়ার বাটনগুলো **B** ***I*** **U** । এগুলো টগ্‌ল্‌ বাটন, ক্লিক করে অন-অফ করা হয়, অথবা ব্যবহার করা যায় **Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U**। এই বাটনগুলো ক্লিক করে অন (হাইলাইট) করে নিয়েও লেখা যায়। তারপর লেখায় এগুলো না চাইলে আবার ক্লিক করে অফ করে নিতে হবে। লক্ষ করো, কোনও অংশে এই স্টাইলগুলো প্রয়োগ করা হলে, কারসার সেই অংশে রাখলে এই স্টাইল বাটনটা হাইলাইট হয়ে বোঝাবে যে এই স্টাইলটা ব্যবহার করা আছে। লেখার পরে যে শব্দে বা অংশে কোনও বিশেষ স্টাইল

প্রয়োগ করতে চাও, সেটা আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে, ও তারপর এই মেনু বাটনগুলো ক্লিক অথবা কীবোর্ড বাটনগুলো একবার টিপতে হবে। এটা করার ঠিক পরেই যদি অন্য অংশেও এটা করতে চাও তো সেই অংশটা সিলেক্ট করে **F4** টিপলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

4.3.8 **Font Effect** (ফন্ট এফেক্ট) ও **Font Color** (ফন্ট কালার)

রিবনের ফন্ট মেনু গ্রুপটার নিচের অংশে পরের কয়েকটা বাটন দিয়ে আমরা লেখার কোনও অংশে ফন্ট এফেক্ট, যেমন **Strike through** (স্ট্রাইক থ্রু), **Superscript** (সুপারস্ক্রিপ্ট), **Subscript** (সাবসক্রিপ্ট), **Change Case** (চেঞ্জ কেস) বা ছোট হাতের লেখাকে বড় হাতের ও উল্টোটা করা, **Font Color** (ফন্ট কালার) করতে পারি একইভাবে। আরও রকমের ফন্ট এফেক্ট আনা যায়, যা **Font Dialogue Box** (ফন্ট ডায়লগ বক্স) খুলে দেখতে পাবে।

4.3.9 **Text Highlight** (টেক্সট হাইলাইট) ও **Character Spacing** (ক্যারেকটার স্পেসিং)

লেখার কোনও শব্দে বা অংশে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা সেটা বিভিন্ন রঙে হাইলাইট করতে পারি। এই রঙগুলো পাবে হাইলাইট বাটনটার পাশের লিস্টে ক্লিক করে। এটা কিন্তু ফন্ট কালারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না। ফন্টের রঙ আর হাইলাইট করার রঙ একই করে ফেললে কিছুই পড়তে পারবে না। টেক্সট হাইলাইট করার বাটনটা এখানেই পাবে। লেখা হয়ে যাওয়ার পরে এটা ব্যবহার করা হয়। বাটনটা ক্লিক করে অন করে নিয়ে লেখা অংশে মাউস কারসার আনলে হাইলাইটারের চিহ্নটা আসছে ও আবার ক্লিক করলে তা চলে যাচ্ছে। অন করে নিয়ে যে অংশটা হাইলাইট করতে চাও, মাউসের লেফট বাটন চেপে সেটা সিলেক্ট করো। ওটা হাইলাইট হয়ে যাবে। হাইলাইটার অন রেখে এভাবে বিভিন্ন অংশ হাইলাইট করা যায় ও তারপর আবার হাইলাইটার বাটনটা ক্লিক করে অফ করে নিতে হবে। হাইলাইট করা অংশ থেকে হাইলাইট তুলে দিতে হলে সেই অংশে সাদা বা রঙহীন হাইলাইট প্রয়োগ করতে হবে।

Character Spacing (ক্যারেকটার স্পেসিং) বিশেষ প্রয়োজন হয়না। এর সাহায্যে আমরা শব্দের বর্ণ বা ক্যারেকটারগুলোকে ইচ্ছেমতো চেপে বা ছড়িয়ে লিখতে পারি, তাদের মাঝের ফাকটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে। এটা করার উপায় পাওয়া যাবে **Font Dialogue Box** (ফন্ট ডায়লগ বক্স) খুলে নিলে।

4.4 **Paragrap** (প্যারাগ্রাফ)

আমাদের লেখা ডকুমেন্টার প্যারা বা পরিচ্ছেদগুলো ও পৃষ্ঠাগুলো কেমন দেখতে হবে তাও আমরা ঠিক করে দিতে পারব।

4.4.1 **Align Text** (অ্যালাইন টেক্সট)

হোম মেনু ট্যাবের রিবনে রাখা প্যারাগ্রাফ গ্রুপটার মেনুগুলো দেখ। এখানে তলার লাইনে আছে **Align Text** (অ্যালাইন টেক্সট) — **Left Align** (লেফট অ্যালাইন), **Align Center** (অ্যালাইন সেন্টার), **Right Align** (রাইট অ্যালাইন), ও **Justify** (জাস্টিফাই)। যেকোনও প্যারাগ্রাফে ব্লিংকিং কারসার রেখে এগুলোর যেটাতে ক্লিক করবে পুরো প্যারাগ্রাফটাই অ্যালাইন করা হয়ে যাবে সেইমতো। আগেও বলা হয়েছে যে কোনও লেখার শেষে **Enter** (এন্টার) টিপলে ওই প্যারাটা শেষ হয়ে পরের লাইন থেকে নতুন একটা প্যারা শুরু হয়। কোনও প্যারাগ্রাফ যেভাবে অ্যালাইন করা থাকবে সেইমতো এই বাটনগুলো হাইলাইট হয়ে থাকবে।

4.4.2 **Line Spacing** (লাইন স্পেসিং)

এরপর আছে **Line Spacing** (লাইন স্পেসিং) বা দুটো লাইনের মধ্যে কতটা ফাক থাকবে তা ঠিক করার ব্যবস্থা। লাইন স্পেসিং বাটনটার লিস্ট ক্লিক করে বিভিন্ন ধরনের স্পেসিং পাব ও তার থেকে ক্লিক করে নিয়ে ঠিক করে দেওয়া যাবে পুরো প্যারাগ্রাফটার লাইনগুলোর মাঝে স্পেসিং কী থাকবে।

4.4.3 **Space Before/After** (স্পেস বিফোর/আফটার)

বেশ কয়েক পাতার কোনও বড় ডকুমেন্ট লেখার সময় প্রথমেই প্যারাগ্রাফের অ্যালাইনমেন্ট ও লাইন স্পেসিং ঠিক করে নেওয়া ভাল। সেই সঙ্গে **Space Before** (স্পেস বিফোর) ও **Space After** (স্পেস আফটার) প্যারাগ্রাফ (পেজ লে-আউটে আলোচনা করব) ঠিক করে রাখা ভাল। তাহলে পরে আর সব প্যারাকে এক রকম করে নেওয়ার ঝামেলাটা হয়না। কারণ, একটি প্যারার পরে এন্টার টিপে যখন আমরা পরের প্যারাগ্রাফে লিখি, তখন আগের প্যারাগ্রাফে যা যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম সেগুলো পরের প্যারাগ্রাফেও থাকে।

4.4.4 **Shading** (শেডিং) ও **Border** (বর্ডার)

এরপরে দুটো মেনু বাটন হল **Shading** (শেডিং) ও **Border** (বর্ডার)। এগুলোর লিস্টে ক্লিক করে পাবে কী কী করা যায়। এগুলো একই ভাবে এক একটা প্যারাগ্রাফে

দেওয়া যায়। এগুলো সাধারণত **Table** (টেব্‌ল্) বা সারণিতেই (তথ্য সাজিয়ে লেখা টেবিল) বেশি ব্যবহার হয়। এখানে অভ্যেস করে দেখতে পারো।

4.4.5 **Bullets** (বুলেটস), **Numbering** (নাম্বারিং) ও **Indent** (ইনডেন্ট)

প্যারাগ্রাফ গ্রুপটার মেনুগুলোতে ওপরের দিকে আর আছে **Bullets** (বুলেটস), **Numbering** (নাম্বারিং), **Increase Indent** (ইনক্রিস ইনডেন্ট), **Decrease Indent** (ডিক্রিস ইনডেন্ট), ও **Show/Hide Paragraph Mark** (শো/হাইড প্যারাগ্রাফ মার্ক)। কোনও প্যারাগ্রাফ ধরে টানা লেখায় পর পর কিছু বিশেষ তথ্য লিখে গেলে তা পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয়। তার বদলে তথ্যগুলো এক এক লাইনে তালিকা করে সাজিয়ে লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বুলেট বা নাম্বারিং করতে পারি। যেমন ধরো নিচে লেখা হল—

- Show/Hide (শো/হাইড)
- Numbering (নাম্বারিং),
- Increase Indent (ইনক্রিস ইনডেন্ট),
- Decrease Indent (ডিক্রিস ইনডেন্ট), ও
- Bullets (বুলেটস)

এটা করার উপায় তথ্যগুলোর এক একটা লাইন লিখে এন্টার দিয়ে পরের লাইন লিখতে হবে ও লেখা সম্পূর্ণ হলে পুরো তালিকাটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। এবার বুলেট বা নাম্বারিং, যেটা চাই সেই মেনুটার লিস্ট খুলে পছন্দ করে ক্লিক করতে হবে। শেখার জন্য এইভাবে একটা বুলেট তালিকা তৈরি করো।

বুলেট করা এই লেখাটার ওপরে ব্লিংকিং কারসার রাখো। দেখবে বুলেট মেনুটা হাইলাইট হয়ে আছে। আর লক্ষ করো ওপরের রুলারটা। ওখানে **First Line Indent** (ফার্স্ট লাইন ইনডেন্ট মার্ক) আর **Hanging Indent** (হ্যাঙিং ইনডেন্ট) চিহ্ন দুটো কোথায় সরে এসেছে।

এবারে পুরো তালিকাটা আবার সিলেক্ট করো ও ইনক্রিস ইনডেন্ট মেনুটা ক্লিক করো। দেখবে এক একবার ক্লিক করাতে পুরো তালিকাটা ডাইনে সরছে, অর্থাৎ ইনডেন্ট বাড়ছে। কমাতে চাইলে এবার ডিক্রিস ইনডেন্ট মেনুটাতে এক একবার করে ক্লিক করে দেখ। এই ইনডেন্টগুলো বাড়ানো কমানোর আরেকটা উপায় হল রুলারের ওপর চিহ্নগুলোতে মাউস কারসার রেখে ডাইনে বাঁয়ে ড্র্যাগ করা।

- ✓ Show/Hide (শো/হাইড)
- ✓ Numbering (নাম্বারিং),

- ✓ Increase Indent (ইনক্রিস ইনডেন্ট),
- ✓ Decrease Indent (ডিক্রিস ইনডেন্ট), ও
- ✓ Bullets (বুলেটস)

পুরো তালিকাটা সিলেক্ট না করে এক একটা লাইনের ইনক্রিস ইনডেন্ট করলে আমরা দেখবো শুধু ওই লাইনটাই ডাইনে সরছে আর তার বুলেট চিহ্নটা পাল্টে যাচ্ছে। এটা লাগে বুলেট বা নাম্বারিং দিয়ে **Multilevel List** (মাল্টিলেভেল লিস্ট) করতে। বুলেট বা নাম্বারিং বাতিল করার উপায় হল ব্যাকস্পেস দিয়ে কাটা বা সিলেক্ট করে মেনু থেকে **None** (নান) ক্লিক করা।

4.4.6 **Sort** (সর্ট), **Show/Hide** (শো/হাইর্ড)

এরপর দেখো **Sort** (সর্ট) বা সাজানো মেনুটার কাজ। দুরকম হতে পারে— **Ascending** (অ্যাসেনডিং) মানে কম থেকে বেশি, বা **Discending** (ডিসেনডিং) মানে বেশি থেকে কম, করে একটা তালিকা সাজানো। পুরো তালিকাটা সিলেক্ট করে নিয়ে সর্ট মেনুটা ক্লিক করো। একটা ডায়লগ বক্স খুলবে, যেখানে প্যারাগ্রাফ সর্ট কীভাবে করতে চাও, অ্যাসেনডিং না ডিসেনডিং, সেটা বলে দিতে পারবে।

এরপর আরেকটা মেনু আছে, **Show/Hide Paragraph Mark** (শো/হাইড প্যারাগ্রাফ মার্ক) । এটা ক্লিক করলে ডকুমেন্টাতে বিভিন্ন চিহ্ন দেখাবে, যেগুলি ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে লাগে। এটা টগ্‌ল্ বাটন। ভুল করে ক্লিক করলে এইসব চিহ্ন দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওই বাটনটা আবার ক্লিক করলে এগুলো চলে যাবে।

4.4.7 **Tab Stops** (ট্যাব স্টপ্‌স)

আগে আমরা কীভাবে টাইপ করে লেখা হয় আলোচনার সময় কীবোর্ডের ট্যাব কীইটার ব্যবহার উল্লেখ করেছিলাম। প্যারাগ্রাফ গ্রুপটার লিস্টের ডায়লগ বক্স আমরা **Tab** (ট্যাব) বাটনটা পাব, যেটা ক্লিক করলে আর একটা ডায়লগ বক্স পাব, যেখানে বিভিন্ন ধরনের **Tab Stops** (ট্যাব স্টপ্‌স) ও কোন্ জায়গায় তা বসাতে হবে, এবং সাধারণ ট্যাব এক একবারে কতটা সরবে বা **Default Tab Stops** (ডিফল্ট ট্যাব স্টপ্‌স) কী রাখব তা বলে দিতে পারব। বিভিন্ন ধরনের ট্যাব, লেখার কোনও অংশে যা আগে বসানো হয়েছে, তাও বাতিল করতে পারব। শেখার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ট্যাবগুলোর সম্বন্ধে জেনে রাখলেই চলবে। এর বিশেষ ব্যবহার পরবর্তী পর্যায়ের কাজে দেখা যাবে।

4.5 **Page Layout** (পেজ লে-আউট)

আমাদের লেখা ডকুমেন্টার পৃষ্ঠাগুলো কেমন দেখতে হবে তা আমরা ঠিক করে দিতে পারব।

4.5.1 **Page Size** (পেজ সাইজ), **Page Orientation** (পেজ ওরিয়েন্টেশন), **Margin** (মার্জিন)

মেনু বারে পেজ লে-আউট মেনু ট্যাবটা ক্লিক করে রিবনে দেখে নাও কী কী রিবন গ্রুপ আছে ও সেগুলোর মধ্যে কী কী মেনু আছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এর সবগুলো না জানলেও চলবে। আপাতত শিখে নিতে হবে কেবল কয়েকটা মেনু মাত্র। রিবনে রাখা **Page Setup** (পেজ সেটআপ) গ্রুপটাতে আছে **Page Size** (পেজ সাইজ), **Page Orientation** ((পেজ ওরিয়েন্টেশন), আর **Margin** (মার্জিন) মেনু। আমাদের উচিত কোনও ডকুমেন্ট লেখার শুরু করার আগে এগুলো ঠিক করে নেওয়া। বেশ কয়েক পাতার বড় ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে এগুলো পরে ঠিক করতে গেলে প্যারাগ্রাফ ও টেক্সট ফরম্যাটে সমস্যা দেখা দিতে পারে, বিশেষত যদি ডকুমেন্টটাতে ছবি বা সারণি (টেব্‌ল্) থাকে।

এই তিনটে মেনুরই নিচে লিস্ট চিহ্নটা আছে, যেটা ক্লিক করে আমরা দেখে নেব কত রকম কী করা যায়। অথবা আমরা পেজ সেট-আপ রিবন গ্রুপটার যে লিস্ট বাটন আছে সেটা ক্লিক করে পেজ সেট-আপ ডায়লগ বক্স পেতে পারি, যেখানে সবকটি বিষয়ই একবারে ঠিক করে নিতে পারি।

পাতার মাপ বিভিন্ন রকমের করার ব্যবস্থা আছে ও দুই ভাবে পাতাতে লেখা যেতে পারে — সাধারণভাবে পাতাকে লম্বা রেখে অথবা আড়াআড়ি রেখে। প্রথমটাকে বলে **Portrait** (পোর্ট্রেট) আর পরেরটাকে বলে **Landscape** (ল্যান্ডস্কেপ)। লেখার এক একটা পৃষ্ঠায় ওপরে, নিচে, বাঁয়ে, ও ডাইনে, কতটা মার্জিন রাখা হবে তাও বলে দেওয়া যাবে। এগুলোকে বলা হয় **Margin Top** (মার্জিন টপ), **Margin Bottom** (মার্জিন বটম), **Margin Left** (মার্জিন লেফট), ও **Margin Right** (মার্জিন রাইট)।

4.5.2 **Section Break** (সেকশন ব্রেক) **New Page** (নতুন পাতা)

সাধারণভাবে একই পেজ সেট-আপ রাখা হয় পুরো ডকুমেন্টার জন্য। প্রয়োজন হলে **Breaks** (ব্রেকস্) মেনুটা ব্যবহার করে **Section Break** (সেকশন ব্রেক) **New**

Page (নতুন পাতা) দিয়ে এক একটা সেকশন বা পরিচ্ছেদে আলাদা পেজ সেট-আপ রাখা যায়। এটা প্রারম্ভিক পর্যায়ে না শিখলেও চলবে।
প্রারম্ভিক পর্যায়ে আপাতত এইটুকুই শেখার। অন্যান্য মেনুগুলোর ব্যবহার পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করতে করতে শিখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

4.6 পরবর্তী পর্যায়ে শেখার — প্রিন্ট ও অন্যান্য মেনু

কমপিউটারের সাথে **Printer** (প্রিন্টার) লাগানো থাকলে যে ডকুমেন্টটা খোলা হয়েছে সেটা **Print** (প্রিন্ট) করা যাবে। এর জন্য ওয়ার্ড মেনু লিস্ট থেকে প্রিন্ট ক্লিক করলে আসে **Print Dialogue Box** (প্রিন্ট ডায়লগ বক্স) যাতে কীভাবে প্রিন্ট করতে হবে বলে দেওয়া যাবে। সর্বদা প্রিন্ট দেওয়ার আগে **Print Preview** (প্রিন্ট প্রিভিউ) দেখে নেওয়া ভাল। সব পাতার লেখা ঠিক ঠাক আছে কিনা বোঝা যাবে।

- কোনও বিষয়ে প্রোজেক্ট ওয়ার্কের রিপোর্ট ইত্যাদি লিখতে বিশেষ প্রয়োজন হবে **Insert** (ইনসার্ট) মেনু থেকে—**Tables** (টেব্‌ল্‌স), **Picture** (পিকচার), **Header** (হেডার), **Footer** (ফুটার), **Page Number** (পেজ নাম্বার), **Shapes** (শেপ্‌স), **Text Box** (টেক্সট বক্স) ইত্যাদি। **Tables** বা **Picture** লেখা পাতায় ইনসার্ট করার পর তা ছোট-বড় করা যাবে ও প্রয়োজন মতো জায়গায় রাখা যাবে, লেআউট থেকে **Size** ও **Text Wrapping** ব্যবহার করে। **Picture**-এর ক্ষেত্রে **Picture**-টাকে রাইট ক্লিক করেও এটা করা যাবে।
- পুস্তিকা বা বই লেখায় কাজে আসে **References** (রেফারেন্সেস) মেনুগুলো।
- **Mailing** (মেইলিং) মেনুগুলোর ব্যবহার হয় বিশেষত অফিসে, একই বয়ানের চিঠি বা তথ্য বহু লোকের নামে লিখতে, যাকে বলা হয় **Mail Merge** (মেইল মার্জ)।
- বিশেষ ফর্মের ছাঁচ বা **Template** (টেমপ্লেট) তৈরি করা যায়, যাতে কেবল মাত্র **Field** (ফিল্ড) নির্দিষ্ট স্থানেই তথ্য লেখা যাবে।
- অফিসের লেটারহেড **Stationery** (স্টেশনারি) হিসাবে বানিয়ে **dot File** (ডট ফাইল) হিসাবে রেখে দেওয়া যায়।

এই রকম আরও বহু কাজ প্রয়োজন মতো করা যায়। কিন্তু এগুলি শেখা যায় একমাত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। ব্যবহার করলে তবেই সঠিক শেখা হয়। নয়তো শেখার জন্য শিখে ভুলে যেতে সময় লাগে না।

অনুশীলন: পাঠ 4-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পর পর যেভাবে শেখা হয়েছে, শব্দগুলো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো পর পর পড়ে মনে করো, পাঠে কী বলা হয়েছে। মনে ঠিক না এলে আবার পাঠের ওই জায়গাটা দেখে নাও।

Microsoft Office (মাইক্রসফট অফিস)
Word (ওয়ার্ড)
Powerpoint (পাওয়ারপয়েন্ট)
Program Menu (প্রোগ্রাম মেনু)
Document File (ডকুমেন্ট ফাইল)

Worksheet Area (ওয়ার্কশীট এরিয়া)
Slide (স্লাইড)
Presentation (প্রেসেন্টেশন)
Presentation File (প্রেসেন্টেশন ফাইল)
Database Management (ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট)
Relationships (রিলেশনশিপ্স)
Forms (ফর্মস)
Database Application File (ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন ফাইল)
Blank Document (ব্ল্যাংক ডকুমেন্ট)
Save Icon (সেভ আইকন)
Dialog Box (ডায়লগ বক্স)
Office Button (অফিস বাটন)
Insert (ইনসার্ট)
Shapes (শেপ্স)
Footer (ফুটার)
Word Art (ওয়ার্ড আর্ট)
Design (ডিসাইন)
Measurement Units (মেসারমেন্ট ইউনিটস)
Left Indent (লেফট ইনডেন্ট)
First Line Indent (ফার্স্ট লাইন ইনডেন্ট)
Centre Tab (সেন্টার ট্যাব)

All Programs (অল্ প্রোগ্রামস)
Excel (এক্সেল)
Access (অ্যাক্সেস)
Document Area (ডকুমেন্ট এরিয়া)
Filename Extension (ফাইলনেম এক্সটেনশন)
Workbook File (ওয়ার্কবুক ফাইল)
Projector (প্রোজেক্টার)
Slide Area (স্লাইড এরিয়া)
Slide show (স্লাইড শো)
Tables (টেবলস)

Query (কোয়েরি)
Reports (রিপোর্টস)
Word Options (ওয়ার্ড অপ্শনস)

Create (ক্রিয়েট)
Ctrl+S (সিটিআরএল+এস)
Folder Location (ফোল্ডার লোকেশন)
Ribbon Bar (রিবন বার)
Tables (টেবলস)
Header (হেডার)
Text Box (টেক্সট বক্স)
Layout (লেআউট)
Format (ফরম্যাট)
Right Indent (রাইট ইনডেন্ট)
Hanging Indent (হ্যাঙগিং ইনডেন্ট)
Left Tab (লেফট ট্যাব)
Right Tab (রাইট ট্যাব)

Decimal Tab (ডেসিমাল ট্যাব)
Page Number (পেজ নাম্বার)
Find (ফাইন্ড)
Spell Check (স্পেল চেক)
Print Layout (প্রিনট লেআউট)
Previous Page (প্রিভিয়াস পেজ)
Browse (ব্রাউস)
Split (স্প্লিট)
Online (অনলাইন)
Insertion Point (ইনসারশন পয়েন্ট)
Paragraph (প্যারাগ্রাফ)
Insert Page Number (ইনসার্ট পেজ নাম্বার)
Scroll Button (স্ক্রোল বাটন)
Selection (সিলেকশন)
Redo (রিডু)
Editing Text (এডিটিং টেক্সট)
Insert Text (ইনসার্ট টেক্সট)
Overtype Mode (ওভারটাইপ মোড)
Ctrl+X
Find (ফাইন্ড)
Alt+F
Spell Check (স্পেল চেক)
Review Menu (রিভিউ মেনু)
Set language (সেট ল্যাঙ্গয়েজ)
Font Size (ফন্ট সাইজ)
Bold (বোল্ড)
Underline (আন্ডারলাইন)
Font Color (ফন্ট কালার)
Superscript (সুপারস্ক্রিপ্ট)
Change Case (চেঞ্জ কেস)
Character Spacing (ক্যারেকটার স্পেসিং)
Align Left (অ্যালাইন লেফট)
Right Align (অ্যালাইন রাইট)
Line Spacing (লাইন স্পেসিং)

Status Bar (স্টেটাস বার)
Go to (গো টু)
Ctrl+G
Language (ল্যাঙ্গয়েজ)
Zoom (জুম)
Next Page (নেক্সট পেজ)
View Ruler (ভিউ রুলার)
Help (হেলপ)
Offline (অফলাইন)
Blinking Cursor (ব্লিংকিং কারসার)
Tab Set (ট্যাব সেট)
Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড)
Delete Text (ডিলিট টেক্সট)
Undo (আনডু)
Repeat (রিপিট)
Formatting Text (ফরম্যাটিং টেক্সট)
Overtype Text (ওভারটাইপ টেক্সট)
Ctrl+C
Ctrl+V
Replace (রিপ্লেস)
Match case (ম্যাচ কেস)
Grammar Check (গ্রামার চেক)
Proofing (প্রুফিং)
Add to Dictionary (অ্যাড টু ডিকশনারি)
Font Style (ফন্ট স্টাইল)
Italics (আইটালিক্স)
Font Effect (ফন্ট এফেক্ট)
Strike through (স্ট্রাইক থ্রু)
Subscript (সাবসক্রিপ্ট)
Text Highlight (টেক্সট হাইলাইট)
Align Text (অ্যালাইন টেক্সট)
Align Center (অ্যালাইন সেন্টার)
Justify (জাস্টিফাই)
Space Before (স্পেস বিফোর)

Space After (স্পেস আফটার)
Border (বর্ডার)
Bullets (বুলেটস)
Indent (ইনডেন্ট)

Multilevel List (মাল্টিলেভেল লিস্ট)
Default Tab Stops (ডিফল্ট ট্যাব স্টপ্স)
Page Size (পেজ সাইজ)
Margin (মার্জিন)
Landscape (ল্যান্ডস্কেপ)
Margin Bottom (মার্জিন বটম)
Margin Right (মার্জিন রাইট)
New Page (নতুন পাতা)
Print Preview (প্রিন্ট প্রিভিউ)
Picture (পিকচার)
References (রেফারেন্সেস)
Mail Merge (মেইল মার্জ)
Field (ফিল্ড)
dot File (ডট ফাইল)

Shading (শেডিং)
Table (টেবল্)
Numbering (নাম্বারিং)
Show/Hide Paragraph Mark (শো/হাইড প্যারাগ্রাফ মার্ক)
Sort (সর্ট)
Page Layout (পেজ লে-আউট)
Page Orientation (পেজ ওরিয়েন্টেশন)
Portrait (পোর্ট্রেট)
Margin Top (মার্জিন টপ)
Margin Left (মার্জিন লেফট)
Section Break (সেকশন ব্রেক)
Printer (প্রিন্টার)
Table (টেবল্স)
Text Box (টেক্সট বক্স)
Mailing (মেইলিং)
Template (টেমপ্লেট)
Stationery (স্টেশনারি)

পাঠ 5. সংখ্যা নিয়ে হিসাবনিকেশ করা—এক্সেল প্রোগ্রামটির ব্যবহার

5.1 প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে

5.2 টাইপ করে তথ্য লেখা ও ভুল শুদ্ধ করা
- 5.2.1 Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড)
- 5.2.2 Data Entry (ডেটা এন্ট্রি)
- 5.2.3 Insert Sheet Rows and Columns (ইন্সারট শীট রো অ্যান্ড কলাম)
- 5.2.4 Selection (সিলেক্শন) ও Copy-Paste (কপি-পেস্ট)
- 5.2.5 Delete Data (ডিলিট ডেটা)

5.3 ওয়ার্কশীটে সংখ্যা নিয়ে কিছু সাধারণ হিসেব করা
- 5.3.1 Addition (অ্যাডিশন)
- 5.3.2 Subtraction (সাবট্র্যাক্শন), Multiplication (মাল্টিপ্লিকেশন) ও Division (ডিভিশন)
- 5.3.3 Formula Setting (ফরমুলা সেটিং)

5.4 Formatting (ফরম্যাটিং) ও Page Layout (পেজ লেআউট)
- 5.4.1 ফন্ট, অ্যালাইনমেন্ট, ওরিয়েন্টেশন, মার্জ, র‍্যাপ
- 5.4.2 Row Height (রো হাইট) ও Column Width (কলাম উইড্থ)
- 5.4.3 Format Cells (ফরম্যাট সেলস)
- 5.4.4 Page Layout (পেজ লেআউট)

5.5 পরবর্তী পর্যায়ে শেখার

অনুশীলন: পাঠ 5-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পাঠ 5. সংখ্যা নিয়ে হিসাবনিকেশ করা—এক্সেল প্রোগ্রামটির ব্যবহার

আমরা ওয়ার্ড (Microsoft Word) প্রোগ্রামটার ব্যবহার শিখেছি। এক্সেল (Microsoft Excel) প্রোগ্রামটা খোলা, বন্ধ করা, ফাইল সেভ করা, ফাইল খোলা ইত্যাদি ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার মতোই হবে। তাই এগুলো আর এখানে আলোচনা করা হল না। আমরা শুরু করব এক্সেলের প্রোগ্রাম উইনডোটা নিয়ে।

5.1 প্রোগ্রাম উইনডোতে কী কী আছে

এর আগে আমরা পেইন্ট ও ওয়ার্ড প্রোগ্রাম উইনডোতে যা যা দেখেছি, যেমন মেনু বার, রিবন বার ইত্যাদি, সেগুলো আর আলোচনা করা হল না। এক্সেল প্রোগ্রাম উইনডোতে নতুন যা দেখছি সেগুলো কী তা জেনে নেব।

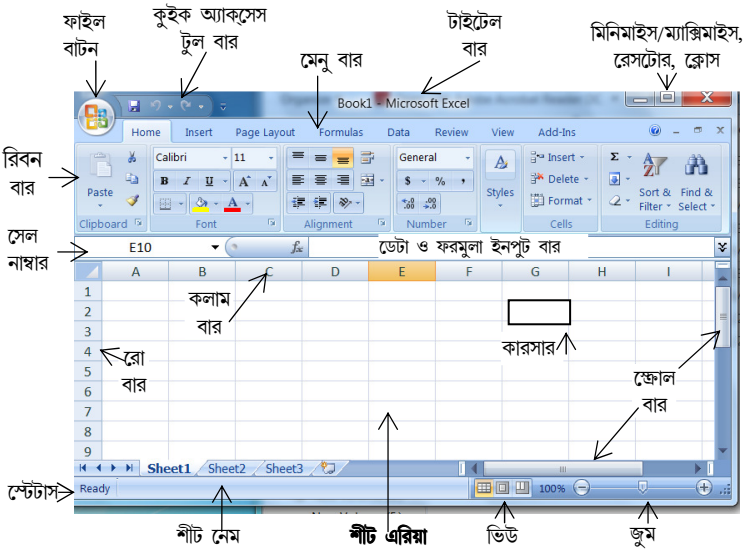

এক্সেল প্রোগ্রামটার তৈরি করা কাজের ফাইলকে **Workbook** (ওয়ার্কবুক) বলে, ও এগুলোর ফাইলনেমের শেষে এক্সটেনশন থাকে .xlsx বা .xls । একটা ওয়ার্কবুকে অনেকগুলো ওয়ার্কশীট রাখা যায়। ওয়ার্কশীট গুলোকে নাম দিয়ে দেখানো হয়, যেমন

ছবিতে দেখানো আছে, Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3,…। একে বলা হয় **Sheet name** (শীটনেম)। এগুলোর নাম আমরা পাল্টাতেও পারি, ও ইচ্ছেমতো নতুন শীট ঢোকাতেও পারি।

মনে করো, এক্সেল প্রোগ্রামটা ব্যবহার করে আমরা প্রতি মাসের হিসাব রাখতে চাই। একটা ওয়ার্কবুক তৈরি করব, ধরা যাক তাকে সেভ করব Monthly Accouts (মান্থলি অ্যাকাউন্টস) নামে। আমরা ওয়ার্ড প্রোগ্রামটাতে যেভাবে ফাইল সেভ করা শিখেছি, এখানেও সেইভাবেই ফাইলটা সেভ করা যাবে। এবার এই ওয়ার্কবুকে আমরা রাখব 12টা মাসের জন্য 12টা ওয়ার্কশীট, ও তাদের নাম দেব মাসের নাম দিয়ে। এটা করার জন্য মাউস কারসারকে যেকোনও একটা শীটনেমের ওপরে রেখে রাইট ক্লিক করে দেখো একটা ডায়লগ বক্স আসছে আর তাতে আছে Insert (ইনসার্ট), Delete (ডিলিট), Rename (রিনেম), Move or Copy (মুভ অর কপি) ইত্যাদি। এইগুলোর সাহায্যে আমরা করতে পারব শীটের নাম পাল্টানো, নতুন শীট ঢোকানো, কোনও শীটকে বাতিল করে মুছে দেওয়া, বা শীটগুলোকে আগে-পিছে করা সাজানো । কোনও শীটকে অন্য শীটের আগে-পিছে করার আরেকটা সহজ উপায় আছে। মাউসের কারসার শীটটার ওপরে রেখে লেফট বাটন চেপে শীটটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে যাওয়া। লক্ষ করো, এক একটা শীটকে লেফট ক্লিক করলে সেটাই খোলে।

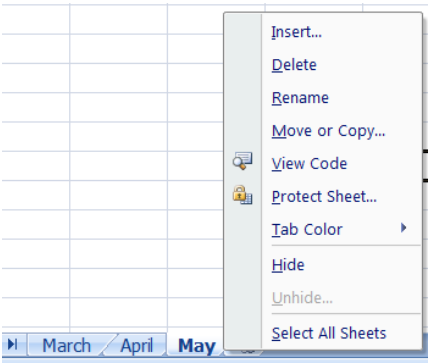

নিজে করে দেখো: এক্সেল প্রোগ্রামটা খুলে কয়েকটা শীট রিনেম, ডিলিট ও ইন্সারট করো, আগে-পিছে করে সাজাও। তারপর ওয়ার্কবুকটাকে একটা নাম দিয়ে কোনও নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সেভ করো ও প্রোগ্রামটা বন্ধ করো।

আমরা আগে ওয়ার্ড প্রোগ্রামটাতে টাইপ করার জন্য ডকুমেন্ট এরিয়া দেখেছি। এক্সেল প্রোগ্রামে এক একটা শীটের জন্য আমরা পাই **Sheet Area (শীট এরিয়া)** যেখানে আমরা বিভিন্ন সংখ্যা ও সংখ্যা সম্বন্ধে বিবরণগুলো টাইপ করে লিখে হিসাবনিকাশ করতে পারি। শীট এরিয়ার বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করা হয় এক একটা খোপ

বা **Cell** (সেল) হিসাবে তার স্তম্ভ বা কলাম ও সারি বা রো-য়ের অবস্থান দিয়ে। এর জন্য **Column Bar** (কলাম বার) দেখায় কলামগুলোর নাম A,B,C,D, ….Z, AA, AB, AC…AZ, BA, BB, …. করে আর **Row Bar** (রো বার) দেখায় রো গুলোর নাম 1,2,3,4…. করে। এর ফলে এক একটা সেলকে আমরা নির্দিষ্ট করি, A1, B23, F19 ইত্যাদি **Cell Number** (সেল নাম্বার) দিয়ে তার কলাম ও রো অবস্থানটা বলে।

এইভাবে একটা শীটে 16 হাজারের বেশি কলাম ও 10 লক্ষের বেশি রো থাকে। সুতরাং, অনেক বড় বড় হিসেবও আমরা একটা শীটেই রাখতে পারি। স্থানাভাবের সমস্যা হয় না। 12 মাসের হিসেব 12টা শীটে রাখতে হবে তা আদৌ নয়। চট করে এক একটা মাসের হিসেব খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা এক একটা শীটে ভাগ করে রাখতে পারি। কিন্তু সারা বছরের হিসেব করতে আমাদের 12টা মাসিক শীট থেকে তথ্যগুলো একটা শীটে কপি-পেস্ট করে নিয়ে সারা বছরের হিসেবে করতে হবে। এটা আমরা পরে শিখব।

এবার লক্ষ করো, এক্সেলের **Program Cursor** (প্রোগ্রাম কারসার) দেখানো হয় একটা আয়তকার বাক্স দিয়ে, যা এক একটা সেলের সীমানা দেখায়। শীট এরিয়ার ঠিক ওপরে বাঁদিকের কোনায় দেখায় কারসারটা যে সেলে আছে তার নম্বরটা। তার পাশেই আমরা দেখি এক একটা সেলে যা লেখা হবে বা লেখা আছে সেই তথ্য বা ফরমুলা। এটাকে আমরা বলেছি **Data and Formula Input Bar** (ডেটা ও ফরমুলা ইনপুট বার)।

5.2 টাইপ করে তথ্য লেখা ও ভুল শুদ্ধ করা

এক্সেল প্রোগ্রামে তথ্যগুলো লিখতে হয় এক একটা সেলে। তাই আমাদের প্রয়োজন মতো সেলে প্রোগ্রাম কারসার নিয়ে যেতে হয়। আমরা আগে ওয়ার্ড প্রোগ্রামে দেখেছি কারসারকে কী করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া বা **মুভ অ্যারাউন্ড** করা যায়। এখানেও একই ভাববে আমরা কারসারটাকে বিভিন্ন সেলে নিয়ে যেতে পারব।

5.2.1 Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড)

প্রোগ্রাম কারসারটা প্রয়োজনমতো সেলে নিয়ে যাওয়া যায় কীবোর্ডের আপ, ডাউন, লেফট, রাইট অ্যারো (কারসার কীই) ব্যবহার করে, বা ট্যাব টিপে এক একটা করে ডানদিকের সেলে সরিয়ে আর এন্টার টিপে পরের লাইনে নিচের সেলটাতে নিয়ে গিয়ে। সহজ উপায় হল, নির্দিষ্ট সেলে মাউস কারসারকে নিয়ে গিয়ে মাউস ক্লিক করা। মনে রেখো, মাউসের স্ক্রোল বাটন বা প্রোগ্রাম উইনডোর স্ক্রোল বার দিয়ে শীটের ওপরে

নিচে বা ডাইনে বায়ে দেখা যায়, কিন্তু প্রোগ্রাম কারসারটা সরে না। এছাড়া কীই বোর্ডের PageUP (পেজ আপ), PageDown (পেজ ডাউন) ব্যবহার করেও আমরা ডিসপ্লে স্ক্রিনটাকে ওপরে নিচে করতে পারি একটা শীটের তথ্যগুলো দেখতে।

এক্সেল প্রোগ্রামে কারসার সরানোর কয়েকটা বিশেষত্ব জেনে রাখতে হবে—

Ctrl + →	কারসার যে রো-য়ে আছে তার শেষ তথ্যের সেলে
Ctrl + ←	কারসার যে রো-য়ে আছে তার প্রথম তথ্যের সেলে
Ctrl + ↓	কারসার যে কলামে আছে তার শেষ তথ্যের সেলে
Ctrl + ↑	কারসার যে কলামে আছে তার প্রথম তথ্যের সেলে
CTRL+ Home	শীটের প্রথমে
CTRL+ End	শীটের শেষে
CTRL+ PageUp	বর্তমানে খোলা শীটের ঠিক আগের শীট
CTRL+PageDown	বর্তমানে খোলা শীটের ঠিক পরের শীট

নিজে করে দেখো: কীবোর্ডের কারসার কীই, ট্যাব, ও এন্টার টিপে দেখো প্রোগ্রাম কারসারটা সেল থেকে অন্য সেলে কীভাবে সরছে। এবার মাউস ক্লিক করেও কারসারকে অন্য সেলে নিয়ে যাও। একই সাথে সেল নাম্বারটাও দেখে রাখো।

5.2.2 Data Entry (ডেটা এন্ট্রি)

কোনও একটা সেলে প্রোগ্রাম কারসার রেখে কিছু সংখ্যা বা লেখা টাইপ করে দেখো, প্রতিটা বর্ণ টাইপ করার পর তার ঠিক ডান পাশে সেলের মধ্যেই টাইপ করে ইন্সারট করার ব্লিংকিং কারসার আসে পরবর্তী বর্ণ টাইপ করার জন্য। এটা ওয়ার্ড প্রোগ্রামটার মতোই।

তাহলে দেখো, এখানে তিন ধরনের কারসার পাচ্ছি প্রোগ্রাম কারসার, মাউস কারসার, আর সেলে টাইপ করার সময় ব্লিংকিং কারসার। প্রোগ্রাম কারসার কোনও সেলে রাখা মানে সেটিকে সিলেক্ট করা

এবার দেখো, সেলে টাইপ করার সাথে সাথে ডেটা ইনপুট বারেও সেটা লেখা হচ্ছে। এরপর কারসার কীই, ট্যাব, এন্টার বা মাউস দিয়ে অন্য সেলে প্রোগ্রাম কারসারটা নিয়ে গেলেই, ওই সেলে লেখাটা ঢুকে যাবে। আবার, কোনও সেলে কিছু লেখা থাকলে, প্রোগ্রাম কারসার সেখানে নিয়ে গেলে ডেটা ইনপুট বারেও লেখাটা দেখাবে।

এবারে প্রশ্ন, ভুল সংশোধন কীভাবে করা যাবে। কোনও সেলে টাইপ করে কিছু লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে কোনও ভুল কিছু টাইপ করে ফেললে আমাদের ব্যাকস্পেস কীই দিয়ে কেটে কেটে সেই জায়গায় গিয়ে, অথবা ঠিক সেইখানে মাউস

ক্লিক করে টাইপ করার কারসারটা এনে, আবার টাইপ করতে হবে। এখানে কীই বোর্ডের কারসার কীই ব্যবহার করে কাজটা হবে না, কারণ কীই বোর্ডের কারসার কীই ব্যবহার করলেই আমরা ওপর-নিচ বা ডাইনে-বাঁয়ের সেলে চলে যাব, আর ওই সেলে ভুলটাই ঢুকে যাবে।

নিজে করে দেখো: মনে করো তুমি একটা সেলে টাইপ করলে 24587 আর তখনি বুঝলে যে ওটা হবে 24677। এই অবস্থায়, ওই সেলে এটা ঢোকানোর আগেই যদি ভুলটা সংশোধন করতে চাও, তাহলে ব্যাকস্পেস কীই দিয়ে 587 কেটে আবার টাইপ করো 677, অথবা 24-য়ের ঠিক পরে মাউস ক্লিক করো ও 587 কেটে 677 টাইপ করো।

এবার দেখা যাক, টাইপ করে লেখার সময় নয়, কোনও সেলে যে তথ্য আগে থেকেই রাখা আছে তাকে আমরা কীভাবে সংশোধন করব। একটা রাস্তা হল, কীইবোর্ডের কারসার কীই ব্যবহার করে ওই সেলটাতে গিয়ে ঠিক তথ্যটা পুরোটাই আবার টাইপ করা। আরো সহজ উপায় হল, ওই সেলে মাউস ডাবল ক্লিক করা। এবারে আমরা টাইপ করার ব্লিংকিং কারসারকে কীই বোর্ডের কারসার কীই দিয়েই ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে ঠিক যেটা সংশোধন করার সেটুকুই নতুন করে টাইপ করে নিতে পারব। কিন্তু এবারে সংশোধিত তথ্যটাকে ঢোকাতে কারসার কীই দিয়ে নয়, হয় ট্যাব বা এন্টার কীই, বা মাউসকে অন্যত্র ক্লিক করতে হবে।

নিজে করে দেখো: কোনও একটা সেলে 47889901 টাইপ করে ঢুকিয়ে নাও, অন্য কোনও সেলে মাউস ক্লিক করে। এবার ওই সেলের সংখ্যাটাকে সংশোধন করো 47879902।

5.2.3 Insert Sheet Rows and Columns (ইন্সারট শীট রো অ্যান্ড কলাম)

বেশ কয়েকটা রো-তে তথ্য লেখার পর এমনটা হতেই পারে যে দুটি রো-য়ের মাঝে আর একটা বা একাধিক রো-তে আরও কিছু তথ্য রাখা প্রয়োজন। এটা করতে আমরা যে রো-টার ওপরে নতুন রো ঢোকাতে চাই সেখানে প্রোগ্রাম কারসারকে নিয়ে রেখে হোম মেনুর সেলস রিবনের ড্রপ ডাউন মেনু ইন্সারট-য়ে ক্লিক করব (Home–Cells–Insert))। এখানে পাব, **Insert Sheet Rows** (ইন্সারট শীট রো)। এটা ক্লিক করলেই একটা নতুন রো এসে যাবে ওপরে। আরও কয়েকটা রো ঢোকাতে হলে আমরা রিপিট ফাংশন কীই F4 (Repeat Function Key F4) ব্যবহার করব। নতুন কলাম আমরা একই ভাবে ঢোকাতে পারবে, যে কলামে কারসারটা আছে তার বাঁ

পাশে, **Insert Sheet Columns** (ইন্সারট শীট কলাম) দিয়ে। নতুন রো বা কলাম ঢোকানোর কাজটা আরো সহজে করা যায় মাউস কারসারকে প্রয়োজন মতো কোনও সেলের ওপর এনে রাইট ক্লিক করে। যে ডায়লগ বক্সটা আসবে তাতে রো বা কলাম ইন্সারট করার মেনুটা পাবে। মনে রেখো, নতুন রো আসবে ওই সেলটা যে রো-তে আছে তার ওপরে আর নতুন কলাম আসবে তার বাঁ পাশে বা আগে।

নিজে করে দেখো: ওয়ার্কশীটের পর পর তিনটে রো আর কলামের সেলে যা হোক কিছু সংখ্যা লেখো। এবার দ্বিতীয় রো-টার ওপরে একটা নতুন রো ঢোকাও। আর তৃতীয় কলামটার আগে দুটো নতুন কলাম ঢোকাও। লক্ষ করো, ঢোকানোর পর রো-বার আর কলাম-বারে নম্বরগুলো আপনি পাল্টে যাবে।

5.2.4 Selection (সিলেক্শন) ও Copy-Paste (কপি-পেস্ট)

এক্সেল ওয়ার্কশীটের সেলগুলোতে তথ্য যে সর্বদাই টাইপ করে ঢোকাতে হবে এমনটা নয়। শীটের একটা বা একাধিক সেলে, অথবা একটা বা একাধিক রো বা কলামে, বা অন্য কোনও শীটে বা এক্সেল ওয়ার্কবুক যে তথ্য রাখা আছে তাকে আমরা সহজেই ওয়ার্কশীটের সেল নির্দিষ্ট জায়গায় ঢোকাতে পারি। এমনকি, ওয়ার্ড প্রোগ্রামের ডকুমেন্টে টেব্ল হিসাবে রাখা তথ্যকেও নিয়ে আসতে পারি। এর জন্য আমাদের কপি-পেস্ট বা কাট-পেস্ট করতে হবে, যা আমরা আগেই ওয়ার্ড প্রোগ্রামে শিখেছি। কপি বা কাট করার জন্য আমাদের প্রথমেই কপি বা কাট করার নির্দিষ্ট স্থানটাকে সিলেক্ট করতে হবে। এক্সেল ওয়ার্কশীটে কীভাবে সিলেক্ট করা যায় সেটা আগে দেখে নেব।

কলাম বারের যেকোনও কলাম নম্বরে মাউস কারসারকে রেখে দেখো একটা নিচে মুখ করা তির চিহ্ন দেখায়। এবার মাউস ক্লিক করলেই পুরো কলামটা ঘিরে মোটা দাগ পরে সিলেক্ট হয়েছে দেখাতে। তারপর আমরা CTRL+C বা CTRL+X করে, অথবা মেনু থেকে বা রাইট ক্লিক করে পুরো কলামটা কপি বা কাট করে নিতে পারি। কপি বা কাট করা হলে দেখা যাবে সিলেক্টেড অংশের চারপাশে ব্লিংকিং রেখা। একইভাবে পুরো একটা রো কপি বা কাট করা যায়। আবার কলাম বারে যে কোনও একটা কলামে মাউস রেখে লেফ্ট বাটন চেপে কলাম বারেই ডাইনে বাঁয়ে মাউস ড্র্যাগ করে বা Shift (শিফ্ট) চেপে কারসার কীই ব্যবহার করেও একাধিক পাশাপাশি কলাম সিলেক্ট করা যায়। একইভাবে রো-য়ের ওপরে নিচে একাধিক পাশাপাশি কলাম বা রো সিলেক্ট করা যায়। সিলেক্ট করার রো বা কলামগুলো পাশাপাশি না হলে শিফ্টের বদলে CTRL ব্যবহার করতে হয়।

ওয়ার্কশীটের ঠিক ওপরে বাঁদিকের কোনায় কলাম বার ও রো বারে সংযোগস্থলে দেখো একটা ত্রিভুজ চিহ্ন মতো আছে। এটাতে ক্লিক করে পুরো ওয়ার্কশীটটাই সিলেক্ট করে নেওয়া যায়।

ওয়ার্কশীটের একাধিক সেলকে আমরা সিলেক্ট ও কপি বা কাট করতে পারি Shift চেপে কারসার কীই ব্যবহার করে ও CTRL+C বা CTRL+X করে, অথবা মাউসের লেফট বাটন চেপে মাউস সরিয়ে বা ড্র্যাগ করে ও তারপর রাইট ক্লিক করে। পেস্ট করার জন্য পেস্ট করার নির্দিষ্ট জায়গার বাঁদিকের ওপরের কোনার সেলে প্রোগ্রাম কারসারকে নিয়ে গিয়ে CTRL+V করে বা মাউস রাইট ক্লিক করে পেস্ট করা যাবে।

লক্ষ করো যে, কপি-পেস্ট করা হলে, একবার পেস্ট করার পরেও সিলেক্শনটা থেকেই যায়, মানে আবার কোথাও তাকে পেস্ট করা যায়। সুতরাং, কপি করা তথ্যগুলো পরপর পেস্ট করা যেতে পারে একাধিক স্থানে। একই বারে একাধিক সেলে পেস্ট করাও যেতে পারে, সেই সেলগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে। একে বলা হয় ক্লিপবোর্ড বা মেমরিতে কপি করে রাখা। এটা চলে যাবে Esc টিপলে, অথবা অন্য কোনও সেলে গিয়ে কিছু টাইপ করলে।

কাট-পেস্ট করা মানে হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভ করা। মাউসের লেফট্ বাটন চেপে ড্র্যাগ করে আমরা এক বা একাধিক সেলে, রো-তে বা কলামে লেখা তথ্যকে সিলেক্ট করে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারব। এটা করতে সিলেক্ট করা সেলগুলো বা রো বা কলামের চারপাশের সিলেকশনের দাগের ওপর মাউস কারসার রাখলেই আমরা মুভ করাবার চিহ্নটা দেখব। সেটা এলে তবেই লেফট্ বাটন চেপে ড্র্যাগ করতে হবে। মনে রেখো, সেই জায়গায় কোনও তথ্য থাকলে তার বদলে এই মুভ করা তথ্য এসে যাবে।

5.2.5 Delete Data (ডিলিট ডেটা)

ওয়ার্কশীটের যেকোনও এক বা একাধিক সেল, রো, কলাম, বা পুরো শীটে রাখা তথ্য আমরা সহজেই মুছে দিতে বা ডিলিট করতে পারি, আগে সেগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে ও তারপর কীবোর্ডের ডিলিট বাটনটা দিয়ে বা সিলেকশনের ওপরে মাউসকে রাইট ক্লিক করে ডিলিট ক্লিক করে।

নিজে করে দেখো: ওয়ার্কশীটের কয়েকটা সেলে কিছু সংখ্যা লিখে ঢোকাও। এবার এগুলোকে অন্য একটা সেলে কপি-পেস্ট করো । কয়েকটা ওপর-নিচে সিলেক্ট করা সেলেও পেস্ট করে দেখো। এইভাবে বেশ কিছু সেল তথ্য দিয়ে ভরো। এবার একটা বা একাধিক রো কপি পেস্ট করো অন্য জায়গায়। কলাম সিলেক্ট করেও এটা করে দেখো।

এরপর কিছু সেলের তথ্য মুভ করাও আন্যত্র। রো আর কলাম কীভাবে মুভ করা যায় দেখে রাখো। এখানেই অভ্যেস করো কিছু সেলের, রো-য়ের আর কলামের সিলেক্ট করা তথ্য ডিলিট করা। পুরো ওয়ার্কশীটের তথ্য কীভাবে ডিলিট করা যায় দেখে রাখ। এক একটা কাজের পরেই কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের **Undo** (আনডু) আর **Redo** (রিডু) বাটন ব্যবহার করে কী হয় দেখে নাও।

5.3 ওয়ার্কশীটে সংখ্যা নিয়ে কিছু সাধারণ হিসেব করা

এবার আমরা এক্সেল প্রোগ্রামটা মূল কাজ সম্বন্ধে জানব। সাধারণ হিসেব বলতে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা বোঝাচ্ছি, ওয়ার্কশীটের বিভিন্ন সেলে তথ্য হিসাবে রাখা সংখ্যাগুলো নিয়ে। এছাড়া, আরো বহু রকমের হিসেব করা যায় ফাংশন মেনু ব্যবহার করে, ও আমরা ফরমুলা বারে আমাদের প্রয়োজন মতো ফরমুলা বা সূত্রও তৈরি করে নিতে পারি, যা পরবর্তী পর্যায়ে শিখতে হবে।

5.3.1 Addition (অ্যাডিশন)

অ্যাডিশন বা যোগ করা যায় যে কোনও একাধিক সেলের সংখ্যাগুলোকে ও সেগুলোর সাথে যেকোনও সংখ্যাকে। যোগফলটা লেখা হয়ে যায় যে সেলটা আমরা চাই সেখানে। সুতরাং, আগে আমাদের ঠিক করে নিতে হবে, কোন্ সেলটাতে আমরা যোগফলটা লিখে রাখতে চাই ও সেটা সিলেক্ট করতে হবে প্রোগ্রাম কারসারকে সেখানে রেখে ।

নিজে করে দেখো: ওয়ার্কশীটের কয়েকটা সেলে কিছু সংখ্যা লিখে ঢোকাও। এবার যোগফল লিখবে যে সেলটাতে সেখানে ক্লিক করে (বা কারসার কীই ব্যবহার করে) সেটাকে সিলেক্ট করো (প্রোগ্রাম কারসারকে রাখো) ও সেখানে টাইপ করো = চিহ্নটা। এবার কীইবোর্ডের কারসার কীই ব্যবহার করে বা মাউস ক্লিক করে সংখ্যা লেখা সেলগুলোর এক একটাতে কারসার নিয়ে যাও ও দেখো যে যোগফল লেখার সেলটাতে = চিহ্নের পাশে এক একটা করে ওই সেলগুলোর নম্বর আসে, আর কারসারটাও ব্লিংক করতে থাকে। এবার যোগ করতে চাও এমন একটা সেলে এই ব্লিংক করা কারসার রেখে টাইপ করো + চিহ্নটা। দেখো যোগফল লেখার সেলে ওই সেল নম্বরটা ও তার পাশে + চিহ্নটা লেখা হয়ে যাবে। এবার ব্লিংক করা কারসার নিয়ে যাও এর সাথে যে সেলটার সংখ্যা যোগ করতে চাও সেই সেলটাতে। আরো একটা সেলের সংখ্যা যোগ করতে চাইলে আবার + চিহ্নটা টাইপ করে সেই সেলটাতে কারসার নিয়ে যাও। দেখে রাখো, তিনটে সেলের সংখ্যা যোগ করার জন্য নিলে নিচের ছবিটার মতো হবে। এবারে **এন্টার** টিপলেই যোগটা হয়ে যাবে ও যোগফলটা লেখা হয়ে যাবে ওই সেলে।

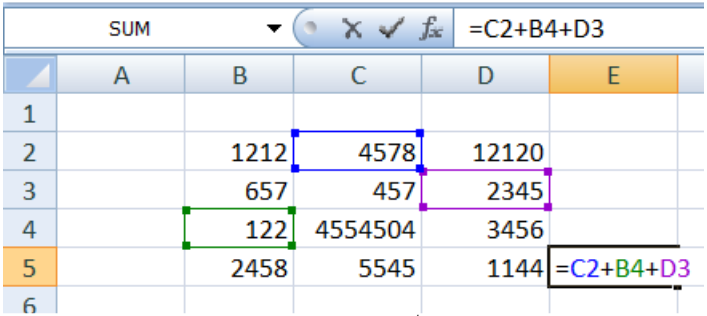

লক্ষ করো: যোগফল লেখার সেলে যোগফলটা সংখ্যায় লেখা দেখালেও আসলে ওখানে আছে একটা যোগের ফরমুলা, যেটা দেখা যাবে ওপরের ফরমুলা বারে।

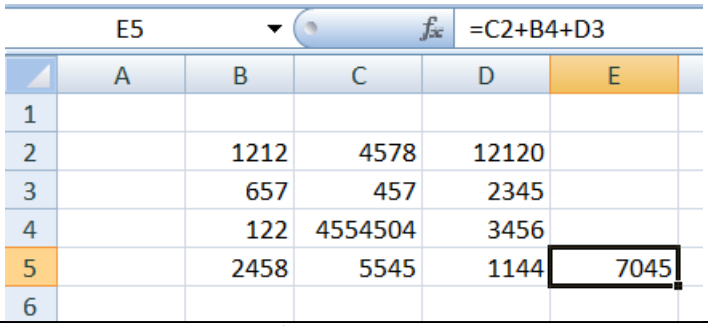

নিজে করে দেখো: এই যোগটাতে আরো কোনও সেলের সংখ্যা যোগ করতে অথবা কোনও একটা সেলের বদলে অন্য একটা সেল নিতে হলে এই ফরমুলা বার গিয়ে ক্লিক করো ও + চিহ্ন দিয়ে আরো সেল নম্বর লেখো, বা কোনও একটা সেল নম্বর পাল্টে অন্য সেল নম্বর লেখো—যেমন, =C4+B4+D3+B2+C5 ।

লক্ষ করো, ফরমুলা বারে ক্লিক করে কোনও কিছু লিখলেই বারের বাঁ পাশে দেখায়, Canel (ক্যানসেল) আর Enter (এন্টার) করার বাটন, f_x লেখাটার আগে। এগুলোতে ক্লিক করেও আমরা লেখা ফরমুলাটা ঠিক করে নিয়ে ঢোকাতে পারি, বা ভুল হলে ক্যান্সেল বা বাতিল করতে পারি।

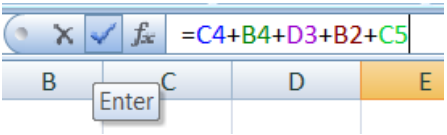

Auto Sum Function (অটো সাম ফাংশন)

হোম মেনুর এডিটিং রিবনে দেখা যাবে **Σ (সিগমা)** চিহ্নটা। এই চিহ্নটার পাশে রাখা ড্রপ ডাউন লিস্টে ক্লিক করে আমরা এক্সেল দিয়ে হিসেব করা যায় এমন আরো অনেক ফাংশন দেখতে পাব, যেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে শেখা যাবে। আমরা এখানে **Σ** দিয়ে কোনও রো, বা কলাম, বা একযোগে রো ও কলামের পাশাপাশি সেলগুলোর সংখ্যা সহজে যোগ করে নেওয়া শিখব।

নিজে করে দেখো: একটা ওয়ার্কশীটের পর পর কয়েকটা কলাম ও রো-য়ের সেলগুলোতে কিছু সংখ্যা লিখে নাও, ও নিচের কাজ গুলো অভ্যেস করো।

1. প্রথম রো-য়ের লেখার শেষে ডান পাশের সেলটাতে আমরা রো-য়ের সেলগুলোর সংখ্যার যোগফলটা লিখতে চাই। এই সেলটাতে মাউস ক্লিক করে নাও। এবার মেনুতে রাখা **Σ** ক্লিক করো। পুরো রো-য়ের সেলগুলো যোগের ফরমুলা দেখাবে। এবার ফরমুলা বারে এন্টার ক্লিক অথবা কীবোর্ডে এন্টার টিপলেই যোগফলটা লেখা হয়ে যাবে। লক্ষ করো, এখানে ফরমুলাটা যোগ চিহ্নের বদলে = **Sum (সাম)** দিয়ে লেখা হল, ব্র্যাকেটের মধ্যে আরম্ভের সেল নম্বর, ও তারপর কোলন (:) চিহ্ন দিয়ে শেষের সেল নম্বর।

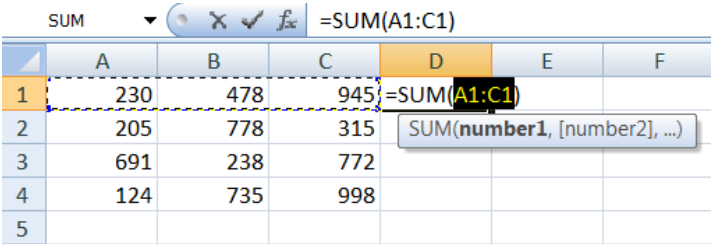

2. একইভাবে প্রথম কলামটার নিচের সেলটাতে কলামের সেলগুলোর সংখ্যার যোগফল লেখো।

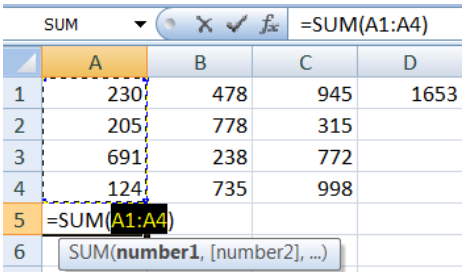

3. এবারে দেখো রো আর কলাম মিলে সবগুলো সেলের যোগফল ডানদিকের

নিচের কোনায় কীভাবে লেখা যাবে। এর জন্য যোগফলের ঘরে মাউস ক্লিক করার পর একদম প্রথম সেলটাতে গিয়ে আবার মাউস ক্লিক করো ও তারপর লেফ্‌ট বাটন চেপে রেখে ডানদিকের নিচের সবশেষ সেলটাতে এসো (Shift চেপে কীই বোর্ডের কারসার কীই ব্যবহার করেও এটা করে দেখো)।

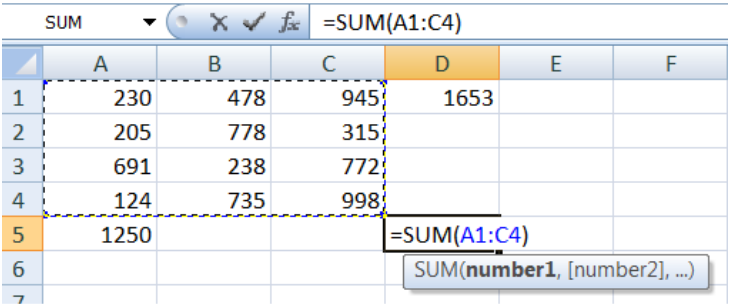

এটা কয়েকবার অভ্যেস করে শিখে নাও, কীভাবে পাশাপাশি বা ওপর-নিচের সেলগুলোর সংখ্যা যোগ করে যোগফলটা অন্য একটা সেলে লেখা যায়। সেই সঙ্গে যোগের ফরমুলা কীভাবে লেখা হয় তা দেখে রাখো।

লক্ষ করো: এন্টার না করা পর্যন্ত ফরমুলার যোগফলটা লেখা হয় না। মাউস দিয়ে বা কীইবোর্ড কারসার কীই দিয়ে যেখানেই যাও ফরমুলার সেলটাই পাল্টায় আর ব্লিংকিং সেল দেখায়। এই অবস্থায় এন্টার না করে এটা বাতিল করার উপায় হল Esc টেপা।

4. এবার দেখো কোনও একটা সেলের ফরমুলা কীভাবে **Cell Formula Copy Paste** (সেল ফরমুলা কপি-পেস্‌ট) করে অন্য সেলেও ব্যবহার করা যায়। মনে করো, প্রথম রো-টার যে যোগফলটা বার করেছিলে, ঠিক তার মতো করেই পরের রো-গুলোরও যোগফল বার করে পর পর নিচে লিখতে হবে। এই কাজটা সহজেই কপি-পেস্‌ট করে করা যায়, বার বার আর ফরমুলা লিখতে হয়না।

প্রথম রো-য়ের শেষের যে সেলে ফরমুলা লিখে হিসেব বার করা হয়েছিল, সেই সেলটাতে মাউস নিয়ে যাও ও রাইট ক্লিক করে কপি করো। এবারে নিচের যতগুলো সেলে এই হিসেবটাই করতে চাও সেই সেলগুলো একসাথে সিলেক্ট করো (মাউস ড্র্যাগ বা শিফ্‌ট চেপে) ও এবার মেনু থেকে বা রাইট ক্লিক করে পেস্‌ট করো। দেখবে সবগুলোতেই একইভাবে হিসেব চলে আসবে।

একইভাবে প্রথম কলামটার যোগফল যে ফরমুলা ব্যবহার করে বার করা হয়েছিল তাকেই পাশের কলামগুলোর জন্যেও ব্যবহার করা যায়।

এখানে দেখে রাখো:

কপি-পেস্ট করা সেলগুলোর ওপরে মাউস ক্লিক করে (বা কারসার নিয়ে গিয়ে) দেখো সেল ফরমুলাগুলো কীভাবে পাল্টেছে। একটা কলাম ধরে ওপর থেকে নিচে এক একটা রো-য়ে পেস্ট করলে ফরমুলায় সেই রো-টার নম্বরটাই পাল্টে লেখা হচ্ছে, কলাম নম্বরটা একই থেকে যাচ্ছে। আর কলামের হিসাবটা ওই রো-তেই পাশের কলামে পেস্ট করলে ফরমুলায় রো নম্বরটা পাল্টায় না, কিন্তু যে কলামে পেস্ট হচ্ছে সেই নম্বরটাই পাল্টে লেখা হয়।

নিজে করে দেখো:

- ফরমুলা দিয়ে অন্য সেলের সংখ্যাগুলো নিয়ে যে হিসেবটা কোনও সেলে করা থাকে, সেটা নিজে নিজেই সংশোধিত হয়, যদি ওই অন্য সেলগুলোতে লেখা সংখ্যার কিছু পরিবর্তন করা হয়।
- ওই অন্য সেলগুলোর মাঝে কোনও নতুন রো বা কলাম ঢোকালেও এই হিসেবটা পাল্টায় না। শুধু হিসেবের ফরমুলায় সেলের নম্বরগুলো আপনি পাল্টে যায়।
- অটোসাম Σ দিয়ে ফরমুলায় যেহেতু আরম্ভ ও শেষের সেলের বিস্তার বা রেন্জ (যেমন, D1:D4, বা A3:F3) দেওয়া থাকে, তাই আমরা মাঝে কোনও রো বা কলাম ঢুকিয়ে সেই নতুন সেলগুলোতে সংখ্যা লিখলে সেটাও আপনি যোগফলে এসে যায়। কিন্তু, একটা একটা করে সেলের মাঝে যোগ চিহ্ন দিয়ে যোগের ফরমুলার ক্ষেত্রে তা হয় না। নতুন সেলগুলোকেও যোগ চিহ্ন দিয়ে ফরমুলায় লিখে নিতে হয়।
- ফরমুলা লিখে সেলগুলোর সংখ্যার যোগ ছাড়াও আমরা যোগ চিহ্ন দিয়ে সেলের সংখ্যার সাথে যেকোনও সংখ্যা যোগ করতে পারি।

5.3.2 Subtraction (সাবট্র্যাক্শন), Multiplication (মাল্টিপ্লিকেশন) ও Division (ডিভিশন)

সাবস্ট্র্যাক্শন বা বিয়োগ, মাল্টিপ্লিকেশন বা গুণ, ও ডিভিশন বা ভাগ করা যাবে একই ভাবে ফরমুলা লিখে, যেমনটা আমরা যোগ করার সময় যোগ চিহ্ন + ব্যবহার করে করেছি। অটো সামের Σ -র মতো এগুলোর কোনও বিশেষ ফাংশন করা যায় না।

কীই বোর্ড থেকে টাইপ করে চিহ্ন গুলো নিয়ে নিতে হবে কীইবোর্ডের ডান দিকের নাম্বার প্যাড থেকে — * মানে গুণ, / মানে ভাগ, আর – মানে বিয়োগ করা।

5.3.3 Formula Setting (ফরমুলা সেটিং)

- কোনও জটিল হিসেবের ফরমুলায় একাধিক সেলের সংখ্যা নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া তৈরি করা যায়, এইসব চিহ্ন ব্যবহার করে । তেমনটা হলে, যে সেলে এই হিসেবটা রাখতে চাই সেখানেই লেখার বদলে তা ফরমুলা বারে লেখা ও সংশোধন করা সহজ হয়।
- জটিল ফরমুলায় কোন্ প্রক্রিয়াটা আগে ও কোন্টা পরে বোঝাতে একাধিক বন্ধনী চিহ্ন দিতে হতে পারে।

নিজে করে দেখো: নিচের ছবি দুটোতে দেখে নাও, ফরমুলা বারে কীভাবে লেখা হয়েছে **F1** ও **G1**সেলে ।

F1 =A1+(B1/D1)*E1-C1+200

	A	B	C	D	E	F
1	30	40	20	40	80	290
2	30	40	20	40	80	230.0167

বন্ধনীর ভেতরে আরেকটা বন্ধনীর ব্যবহার ভাল করে দেখে নাও। ভুল হলে ফরমুলাটাই দেওয়া যাবে না।

F2 =A2+B2/(D2*(E2-C2))+200

	A	B	C	D	E	F
1	30	40	20	40	80	290
2	30	40	20	40	80	230.0167

- কোনও সেলের ফরমুলা অন্য সেলে কপি পেস্ট করার সময় একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কোনও রো-য়ের সেলগুলো নিয়ে ফরমুলাটা যে সেলে লেখা হয়েছে, তাকে ডান বা বাঁ পাশের কলামের সেলে পেস্ট করলে ফরমুলাতে কলাম-সেল গুলোও ডান বা বাঁ পাশের হয়ে যাবে। একই কলামের সেলে পেস্ট করলে তা হবে না, শুধু রো-সেল গুলোই পালটাবে। আবার, কলাম-য়ের সেলগুলো নিয়ে ফরমুলাটা যে সেলে লেখা হয়েছে, তাকে ওপরের বা নিচের রো-য়ের সেলে পেস্ট করলে ফরমুলাতে রো-সেল গুলো ওপরের বা নিচের হয়ে যাবে। একই রো-য়ের

ডান বা বাঁ পাশের সেলে পেস্ট করলে তা হবে না, শুধু কলাম-সেল গুলোই পালটাবে।

নিজে করে দেখো: নিচের ছবি দুটোতে দেখে নাও, ফরমুলা বারে কীভাবে লেখা হয়েছে, G1 আর A7 সেলে ।

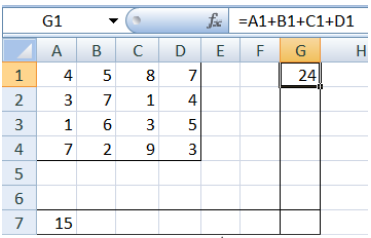

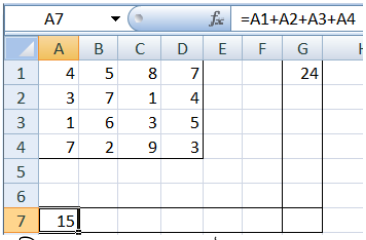

G1-কে H1আর F1-য়ে পেস্ট করে দেখে নাও কী হয়। F1-য়ে পেস্ট করা যাবে না, লেখা আসবে, **#REF!**, যার মানে ফরমুলার ওই সেলটা পাওয়া যাচ্ছে না । যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির ফরমুলার কোনও সেলে সংখ্যার বদলে অন্য কিছু লেখা থাকলে প্রক্রিয়াটা হবে না, **#VALUE!** দেখাবে । একইভাবে A7-কে A8 আর A6-য়ে পেস্ট করে দেখে নাও।

- ফরমুলা দিয়ে লেখা কোনও প্রক্রিয়ার মধ্যেই যদি একটা সেলের সংখ্যা ওই ফরমুলা দিয়েই বের করা হয়ে থাকে, তাহলে **Error Message** (এরর মেসেজ) আসবে **Circular Reference** (সার্কুলার রেফারেন্স) ।

5.4 Formatting (ফরম্যাটিং) ও Page Layout (পেজ লেআউট)

5.4.1 ফন্ট, অ্যালাইনমেন্ট, ওরিয়েন্টেশন, মার্জ, র‍্যাপ

ওয়ার্কশীটের বিভিন্ন সেল, রো, বা কলাম সিলেক্ট করে নিয়ে লেখার হরফ বা ফন্ট, তার সাইজ, স্টাইল ইত্যাদি **Home Menu** (হোম মেনু) রিবনের **Font** (ফন্ট) গ্রুপ থেকে করা যাবে, যেমনটা আমরা আগে ওয়ার্ডে করা শিখেছি। এর পাশের গ্রুপ **Alignment** (অ্যালাইনমেন্ট) থেকে আমরা সেল সিলেক্ট করে তার লেখাকে সেলের বাঁ বা ডান ধারে, মাঝে করে (হরাইজন্টাল), আর ওপরে, নিচে অথবা সেলের মাঝে (ভার্টিকাল) সাজাতে পারব। **Cell Orientation** (সেল ওরিয়েন্টেশন) দিয়ে সেলের লেখাটাকে ওপরে নিচে, কোনাকুনি করা যায়।

বিভিন্ন রো-য়ের আরম্ভে বা কলামের ওপরের সেলে আমরা নাম লিখি রো বা কলামের সংখ্যাগুলো কী বোঝাতে। এগুলো রো বা কলামের শিরোনাম বা **Label**

(লেবেল)। এছাড়া টেবল তৈরি করতে তারও শিরোনাম দিতে হয়। লেবেল লেখার সময় বিশেষ কাজে আসে সেল **Merge** (মার্জ), **Unmerge** (আন্‌মার্জ) আর **Wrap** (র‍্যাপ) টেক্সট।

লেবেল লেখার সময় দেখা যায়, একটা সেলের টাইপ করা লেখা সেই সেল থেকেই শুরু হয়। এটা যদি একাধিক কলাম বা রো-য়ের শিরোনাম হয়, তাহলে চাইব যে লেখা শিরোনামটা যেন তাদের মাঝামাঝি থাকে। এর জন্য পাশাপাশি বা ওপরে-নিচে প্রয়োজন মতো সেল সিলেক্ট করে **Merge** (মার্জ) ও সেন্টার করে নিতে হয়। এতে করে সিলেক্ট করা সেলগুলো জুড়ে গিয়ে একটা সেল হিসাবে দেখায়। আবার, একটা সেলের লেখা একটা লাইন ধরেই চলে ও তা পাশের সেলে চলে গেলে চাপা পড়ে যায় পাশের সেলের লেখায়। এখানে মার্জ করা যায় না, কারণ দুটো সেলের লেখা আলাদা করে রাখা যায় না একটা সেলে। তাই এখানে আমরা **Wrap** (র‍্যাপ) টেক্সট ব্যবহার করি, যার ফলে ওই সেলটার জায়গাতেই দুটো বা তিনটে লাইনে পেয়ে যাই। ওপরের ছবি দুটো দেখো। ওপরের অংশে আমরা টাইপ করে যা পাই তা দেখানো হয়েছে A, B, C, D কলামের রো 7 পর্যন্ত। নিচের অংশে এটাকেই 9 নম্বর রো থেকে কপি-পেস্ট করে ফরম্যাট করা।

	A	B	C	D
1	**Students' Height and Weight**			
2	Class	Measurem	Students	
3			Boys	Girls
4	Class II	Height		
5		Weight		
6	Class III	Height		
7		Weight		
8				
9	**Students' Height and Weight**			
10	Class	Measure ment	Students	
11			Boys	Girls
12	Class II	Height		
13		Weight		
14	Class III	Height		
15		Weight		

নিজে করে দেখো: কী কী করা হয়েছে লক্ষ করো । 9 নম্বর রো-তে পাশাপাশি চারটে সেল মার্জ করে সেন্টার করা হয়েছে। A-কলামের সেল 10-11, 12-13, ও 14-15 ওপর-নিচে দুটো করে নিয়ে মার্জ করে সেন্টার করা হয়েছে, ও তারপর ভার্‌টিকাল অ্যালাইনমেন্টও সেন্টার করা হয়েছে। B10 সেলটাতে র‍্যাপ টেক্সট করে তারপর ভারটিকাল সেন্টার করা হয়েছে। C10 আর D10 সেল দুটো মার্জ করে সেন্টার করা হয়েছে, ও ভারটিকাল হরাইজন্টাল ।

5.4.2 Row Height (রো হাইট) ও Column Width (কলাম উইড্থ)

ওয়ার্কশীটের রো-গুলো ও কলাম-গুলো কতটা চওড়া করব, তা আমরা ঠিক করে নিতে পারি। এটা করার সহজ উপায় হল রো বা কলাম বারে এক একটা (বা একসঙ্গে একাধিককে সিলেক্ট করে) রো বা কলামের ঠিক ধারের লাইনটার ওপরে মাউসকে নিয়ে গেলে ড্র্যাগ করার চিহ্নটা দেখা যাবে। তখন মাউসের লেফ্ট বাটন চেপে বারের ওপরে থেকেই মাউস দিয়ে ড্র্যাগ করতে হবে। কলাম-য়ের ক্ষেত্রে বাঁয়ে ড্র্যাগ করলে কলামের প্রস্থ বা উইড্থ কমবে, ডাইনে গেলে বাড়বে। রো-য়ের ক্ষেত্রে ওপরে উঠলে রো-য়ের হাইট বা উচ্চতা কমবে, নিচে নামলে বাড়বে। আর একটা উপায় হল, **Home Menu** (হোম মেনু) রিবনের **Cells** (সেলস) গ্রুপ থেকে পাওয়া যাবে ফরম্যাট। এটাতে রাখা ড্রপ ডাউন বাটনটা ক্লিক করলে যে ডায়লগ বক্স আসে, তাতে রো হাইট, কলাম উইড্থের মাপ কতটা চাই আর চাইলে সেলের ভেতরের লেখা অনুযায়ী অটো ফিট করা যাবে (সিলেক্টেড রো বা কলাম নিয়ে)। কোনও সেল প্রস্থে অতিরিক্ত ছোট হলে লেখা সংখ্যাকে ##### চিহ্ন দিয়ে দেখায়।

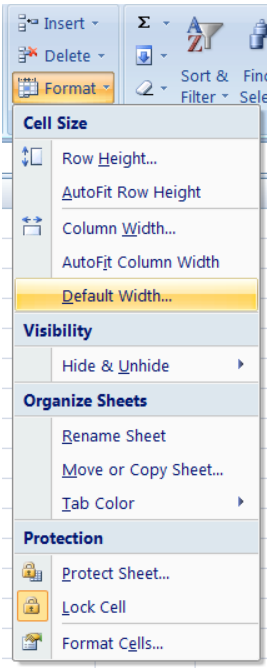

এই ড্রপ ডাউন ডায়লগ বক্সেই পাওয়া যায় **Format Cells** (ফরম্যাট সেলস), যা কাজে লাগে। রো-য়ের উচ্চতা আর কলাম-য়ের প্রস্থ বাড়াতে কমাতে হতে পারে এক একটা পাতার মাপের মধ্যে ওয়ার্কশীটকে রাখতে। এছাড়া, হোম মেনুর রিবনের **Styles** (স্টাইলস) থেকে আমরা ওয়ার্কশীটের তথ্যগুলোকে **Tables** (টেবলস) করে নিতে, ও বিভিন্ন সেল নানাভাবে রঙ করে নিতে পারি। ওয়ার্কশীটে পাতার মাপটা ডানদিক ও নিচে দেখিয়ে দেওয়া হয় **Page Layout** (পেজ লে-আউট) করলে বা ফাইল মেনু থেকে প্রিন্ট দিয়ে **Print Preview** (প্রিন্ট প্রিভিউ) করলে।

5.4.3 Format Cells (ফরম্যাট সেলস)

(হোম মেনু) রিবনের **Number** (নাম্বার) থেকে আমরা একটা বা একাধিক সিলেক্ট করা সেলের **Data type** (ডেটা টাইপ) বা তথ্য কীধরনের তা বলে দিতে পারি —

যেমন, সংখ্যা, কথায় লেখা, দিন-তারিখ, ভগ্নাংশ, শতকরা ইত্যাদি। সংখ্যার ক্ষেত্রে কটা **Decimal Places** (ডেসিম্যাল প্লেসেস) বা দশমিক স্থান রাখা হবে সেটাও বলে দেওয়া যায়। এগুলোই আর বিস্তারিতভাবে করা যাবে সেল ফরম্যাট দিয়ে। এটা নাম্বার লেখাটাতে রাখা ড্রপ ডাউন মেনু ক্লিক করে পাওয়া যায়, আবার, **Cells** (সেলস) গ্রুপটা থেকেও পাওয়া যায়।

5.4.4 Page Layout (পেজ লেআউট)

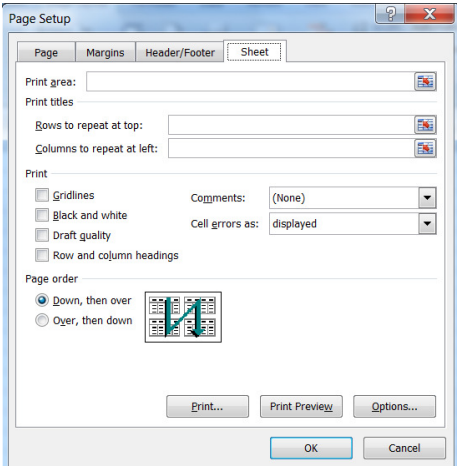

এক্সেল প্রোগ্রামেও আমরা ওয়ার্ডের মতো করে পেজ লে-আউট ঠিক করে দিতে পারব যেমন, **Page Size** (পেজ সাইজ), **Margin** (মার্জিন), **Page Orientation** (পেজ ওরিয়েন্টেশন), **Page Break** (পেজ ব্রেক)। এগুলো পাওয়া যাবে হোম মেনুর পেজ লে-আউট রিবনে। এছাড়া বাড়তি পাই, **Print Titles** (প্রিন্ট টাইটেলস), যেখানে আমরা প্রিনট করার সময় **Rows to repeat at top** (রো-স টু রিপিট অ্যাট টপ) আর **Columns to repeat at left** (কলাম-স টু রিপিট অ্যাট লেফট্) পাওয়া যায়। রিবনটার ড্রপ ডাউন মেনু ক্লিক করেও এগুলো পাওয়া যাবে। এটা করে প্রতিটি ছাপা পাতায় রো ও কলামের শিরোনাম পাওয়া যায়।

নিজে করো:

হরিবাবুর চার ছেলে, রাম, শ্যাম, যদু, আর মধু। হরিবাবু তাঁর নানা ধরনের সম্পত্তির মূল্য নিচের তালিকায় দেওয়া ভাগ অনুসারে ছেলেদের ভাগ করে দিলেন ও বাকি যা থাকল তা দান করে দিলেন। তালিকাটা সম্পূর্ণ করে বের করো কোন্ ছেলে কত টাকা পেল (পয়সার হিসাব বাদ দিয়ে)।

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Property	Value (Rs.)	Ram	Shyam	Jadu	Madu	Total Sons	Balance Donation
2			2/7th	3/7th	1/8th	1/9th		
3	Land	1250000						

4	House	460000						
5	Car	350000						
6	Ornaments	600000						
7	Cash	800000						
8	Total							

[সূত্র: প্রথম রো-তে C3, C4….-য়ের ফরমুলা হবে পর পর =B3*2/7, =B3*3/7 … ইত্যাদি। G3-তে টোটাল করে নিতে হবে, ও তারপর দানের টাকা পাওয়া যাবে H3 =B3–G3। এরপর এই রো-য়ের বের করা সেলগুলো কপি করে নিয়ে পরের রো-গুলোতে পেস্ট করতে হবে। পয়সা বাদ দেওয়ার জন্য সেল ফরম্যাট দিয়ে নাম্বার থেকে ডেসিমাল বাদ দিতে হবে, শিরোনাম দিতে হবে, এক পাতায় ধরাতে ফন্ট সাইজ কমাতে হবে, রো, কলাম আর টেবল বর্ডার দিতে হবে, ইত্যাদি। নিচের সারণিটা দেখো।]

Distribution of Property by Haribabu

Property	Value (Rs.)	Ram 2/7th	Shyam 3/7th	Jadu 1/8th	Madu 1/9th	Total Sons	Balance Donation
Land	1250000	357143	535714	156250	138889	1187996	62004
House	460000	131429	197143	57500	51111	437183	22817
Car	350000	100000	150000	43750	38889	332639	17361
Ornaments	600000	171429	257143	75000	66667	570238	29762
Cash	800000	228571	342857	100000	88889	760317	39683
Total	3460000	988571	1482857	432500	384444	3288373	171627

বার করো:

1. মোট ডোনেশনের শতকরা কত ভাগ এল বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি থেকে।
2. ল্যান্ডের মূল্য বেড়ে গেল 100000 টাকা, গাড়ির মূল্য কমে গেল 150000 টাকা। এবার কোন্ ছেলে কত পাবে।

5.5 পরবর্তী পর্যায়ে শেখার

পরবর্তী পর্যায়ে এক্সেল প্রোগ্রাম দিয়ে শেখা যাবে, **Sort** (সর্ট), **Subtotal** (সাব-টোটাল), **Pivot Table** (পিভোট টেবল), নানা ধরনের **Function** (ফাংশন) ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের **Chart** (চার্ট) তৈরি করে তথ্যকে ছবিতে দেখানো, **Statistical Analysis** (স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস) বা রাশিবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ, ইত্যাদি।

অনুশীলন: পাঠ 5-য়ে শেখা শব্দের তালিকা

পর পর যেভাবে শেখা হয়েছে, শব্দগুলো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো পর পর পড়ে মনে করো, পাঠে কী বলা হয়েছে। মনে ঠিক না এলে আবার পাঠের ওই জায়গাটা দেখে নাও।

Workbook (ওয়ার্কবুক)
Sheet Area (শীট এরিয়া)
Cell Number (সেল নাম্বার)
Data and Formula Input Bar (ডেটা ও ফরমুলা ইনপুট বার)
Data Entry (ডেটা এন্ট্রি)
Insert Sheet Columns (ইন্সারট শীট কলাম)
Copy-Paste (কপি-পেস্ট)
Addition (অ্যাডিশন)
Σ (সিগমা)
Cell Formula Copy Paste (সেল ফরমুলা কপি-পেস্ট)
Multiplication (মাল্টিপ্লিকেশন)
Formula Setting (ফরমুলা সেটিং)
#VALUE!
Formatting (ফরম্যাটিং)
Font (ফন্ট)
Cell Orientation (সেল ওরিয়েন্টেশন)
Merge (মার্জ)
Wrap (র‍্যাপ)
Column Width (কলাম উইড্থ)
Format Cells (ফরম্যাট সেলস)
Print Preview (প্রিন্ট প্রিভিউ)
Data type (ডেটা টাইপ)
Page Size (পেজ সাইজ)
Page Orientation (পেজ ওরিয়েন্টেশন)
Print Titles (প্রিন্ট টাইটেলস)

Sheet name (শীটনেম)
Cell (সেল)
Program Cursor (প্রোগ্রাম কারসার)
Move Around (মুভ অ্যারাউন্ড)

Insert Sheet Rows
Selection (সিলেক্শন)

Delete Data (ডিলিট ডেটা)
Auto Sum Function (অটো সাম ফাংশন)
= Sum (সাম)
Subtraction (সাবট্র্যাক্শন)

Division (ডিভিশন)
#REF!
Circular Reference (সার্কুলার রেফারেন্স)
Page Layout (পেজ লেআউট)
Alignment (অ্যালাইনমেন্ট)
Label (লেবেল)
Unmerge (আনমার্জ)
Row Height (রো হাইট)
#####
Tables (টেবলস)
Number (নাম্বার)
Decimal Places (ডেসিম্যাল প্লেসেস)
Margin (মার্জিন)
Page Break (পেজ ব্রেক)
Rows to repeat at top (রো-স টু রিপিট অ্যাট টপ)

Columns to repeat at left (কলাম-স টু রিপিট অ্যাট লেফ্ট)
Subtotal (সাব-টোটাল)
Function (ফাংশন)
Statistical Analysis (স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস)

Sort (সর্ট)
Pivot Table (পিভোট টেবল)
Chart (চার্ট)

সংযোজন 1. বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ও ইন্টারনেট সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা

প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের রোজকার জীবনে না হলেও, শহর-বাজারে কমপিউটারের ব্যবহার জীবনের একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গই হয় গেছে। নিরক্ষর ব্যক্তিকেও দেখা যায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে। সেও তো একধরনের কমপিউটার প্রযুক্তির ফসল।

আজকাল লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা বা চর্চা থেকে শুরু করে তথ্য-নির্ভর যে কোনও কাজেই কমপিউটারের ব্যবহার হয়। **Communication** (কমিউনিকেশন) বা তথ্য দেওয়া-নেওয়ায় যোগাযোগ করা, চিকিৎসা শাস্ত্রে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কোনও কিছুর ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেখা, ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাবপত্র লেখা, জিনিসপত্র বেচাকেনা, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা-পয়সার লেনদেন, যাবতীয় বিষয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান সঞ্চয় করে রাখা ও তার বিশ্লেষণ করা, যে-কোনও কাজের জটিল পরিমাপ ও হিসেব-নিকেশ করা, এমনকি ছবি আঁকা বা ক্যামেরায় তোলা ও দেখা, গান রেকর্ড করা ও শোনা, সিনেমা টিভি, মোবাইল ফোনের ব্যবহার — সর্বত্রই কমপিউটারের ব্যবহার।

বলা হয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে গত 1990 দশক থেকে এক নতুন যুগ শুরু হয়েছে, যাকে বলা হয় **Information and Communication Technology Age** (ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এজ) বা সংক্ষেপে **ICT**-র যুগ, যার মানে হল, প্রায় সর্বস্তরের তথ্য-নির্ভর কাজকর্মে কমপিউটারের ব্যবহার। একে আরেক ভাবে বলা হয় **Digital** (ডিজিটাল) এজ। এর কারণ, কমপিউটার কাজ করে যাবতীয় তথ্য ও নির্দেশকে ডিজিটাল করে নিয়ে । **Information** (ইনফরমেশন) বা তথ্য বলতে বোঝায় যা-কিছু আছে বা হয়, যা-কিছু দেখি, শুনি, বলি বা করি, তার সবকিছুই এক একটি তথ্য। তথ্যকে ডিজিটাল করে নেওয়া বলতে কী বোঝায় তা আমরা পরের সংযোজনে আলোচনা করব। তথ্য-নির্ভর যাবতীয় কাজে কমপিউটার ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই আজকাল বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তি বা **Information Technology** (ইনফরমেশন টেকনোলজি)।

এই ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমাগত অগ্রগতি ঘটছে আর আমরা অনেক অনেক তথ্য একযোগে বিশ্লেষণ ও খুবই সহজে কোনও ক্ষুদ্র মাধ্যমে সঞ্চয় করে রাখতে পারছি। একটা আলমারিতে হয়তো চার-পাঁচশ বই রাখা যায়। তথ্য-প্রযুক্তির ফলে এই রকম একাধিক আলমারির বই আমরা ডিজিটাল তথ্য করে রাখতে পারি ছোট্ট একটা **SD Card (Secure Digital Card)** (এসডি কার্ড–সিকিয়োর ডিজিটাল কার্ড) বা **Memory Card** (মেমরি কার্ড)-য়ে, যাকে **Chip** (চিপ্) বলে।

কমপিউটার দিয়ে এতসব তথ্য-নির্ভর কাজ করার যে প্রযুক্তি, তার মূলত দুটো দিক। একটা হল কমপিউটার নামক যন্ত্রটা ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বা **Accessory** (অ্যাক্সেসরি) বা **Input Output Device** (ইনপুট আউটপুট ডিভাইস), যেগুলোকে নিয়ে বলা হয় **Hardware** (হার্ডওয়্যার)। হার্ডওয়্যার বলার মানে এগুলোকে ধরা-ছোঁয়া যায়। অন্যটা হল **Software** (সফ্টওয়্যার), যা হল কমপিউটার বুঝতে পারে এমনভাবে দেওয়া কিছু নির্দেশের সমষ্টি, যার ফলে কমপিউটার সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজগুলো করে। এগুলো লিখিত আকারে কমপিউটারে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই নির্দেশগুলো কোনও বস্তু নয়, যাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। তাই একে সফ্টওয়্যার বলে বা **Computer Program** (কমপিউটার প্রোগ্রাম)-ও বলা হয়।

বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়্যার

কমপিউটার প্রোগ্রামের জগতে আছে প্রায় অসংখ্য প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়্যার। আর প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে, পুরনোগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাই কোনও নির্দিষ্ট বা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা অসম্ভব। বলা যায়, তথ্য-নির্ভর যেকোনও কাজের জন্যই কোনও না কোনও সফ্টওয়্যার নিশ্চয় আছে। সাধারণত, যেগুলো খুবই বেশি ব্যবহার হয় (বর্তমানে), সেগুলোকে মোটামুটি একটা ভাগ করা যায়, কোন্ কাজে ব্যবহার হয় সেই অনুযায়ী। নিচে উল্লেখ করা প্রোগ্রামগুলো অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত বাতিল হয়ে অন্য কোনও নতুন প্রোগ্রাম আসবে। এটা তাই শুধুই একটা ধারণা করার জন্য দেওয়া হল।

- **Computer Language** (কমপিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ)—
  C, C++, C# (sharp), Java, Javascript, HTML, Python, PHP, Ruby, etc.
- কমপিউটারটা যে চলবে তার **Operating System** (অপারেটিং সিসটেম)—
  Microsoft Windows; Apple macOS (Macintosh or Mac); Linux Operating System (Ubuntu), etc.
- নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের **Application Program** (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম)—
  - Word processors— Microsoft Word, WordPerfect, TextMaker, Oracle Open Office Writer, Google Doc etc.
  - Photo Editing Software—Adobe Photoshop, Skylum Luminar, Capture One, Adobe Lightroom, etc.
  - Animation and Graphics software—Adobe Macromedia Flash, HTML5, KeyShot, PowToon, K-3D, etc.

- Media players— VLC, KMPlayer, DivX, ACG, etc.
- Enterprise Resource Planning software —NetSuit. BluePrint OneWorld, Procurify, Bitrix24, SAP Business ByDesign, etc.
- Accounting and Financial software—Tally, Integral Accounting Enterprise, FreshBooks, ZohoBooks, etc.
- Gaming — Razor Cortex, LogMeln Hamachi, Steam, TeamSpeak, etc.
- এছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কাজে সাধারণত ব্যবহার হয়, বা নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী বানানো (কাস্টমাইসড) সফ্টওয়্যারগুলো তো আছেই।

➢ কমপিউটারের সফ্টওয়্যারগুলো ঠিকঠাক করে রাখা ও চালানোর **Utility Software** (ইউটিলিটি সফ্টওয়্যার)— Compression (Zip/Rar); Portable Document (Adobe/Foxit); File Converters; Hiren BootCD, Acronis True Image, PcTools, Norton Utility etc.

➢ **Internet related** (ইন্টারনেট সম্পর্কিত)—
- Email — google mail, hotmail, yahoo, rediffmail etc.
- Web browsers—Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc.
- Social Network — Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, etc.
- GPS softwares — GoogleMaps, Here WeGo, Mapfactor, Navit, etc.
- Hacking and Ethical Hacking softwares —Metaspoilt, Nessus, Hydra, WireShark, Nmap, oclHashcat, Maltego, etc.

➢ **Smart Phone System Software** (মোবাইল স্মার্ট ফোনের সিসটেম সফটওয়্যার)—Google's Android OS, Apple iOS etc. ও **Apps** (অ্যাপ্স)— WhatsApp, Messenger, Skype, Instagram etc.

➢ **Malware** (ম্যল্ওয়্যার) ভাইরাস, ওয়ার্মস, ট্রোজান, রুটকিট, বটস্, বাগ্স, স্পাইওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, র‍্যানসামওয়্যার, ইত্যাদি— Melissa, Sasser, Zeus, Conficker, Stuxnet, CIH, CodeRed, Mydoom, etc. (এগুলোর কোনও তালিকা এতই বড় যে এখানে দেওয়া অসম্ভব) ও

Antivirus (অ্যান্টি-ভাইরাস)—ESET NOD32, Webroot SecureAnywhere, Kaspersky, Panda, Trend Micro, AVG, Avast, Avira, QuickHeal, McAfee, MicrosoftSecurityEssential, etc.

ইন্টারনেট

Internet (ইন্টারনেট) কথাটা এসেছে Interconnected Network (ইন্টার-কানেক্টেড নেটওয়ার্ক) থেকে। একটা কমপিউটার থেকে আরেকটা কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। এই থেকে শুরু হয় সারা বিশ্বের এক প্রান্তের একটি কমপিউটার দিয়ে অন্য প্রান্তের আরেকটি কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ করা, তথ্য দেওয়া-নেওয়া করা। এর ফলে সৃষ্টি হয়ে গেছে বিশ্ব জুড়ে এক আন্তর্জাল, যাকে ইংরেজিতে বলে নেটওয়ার্ক। বিশ্বজোড়া এই নেটওয়ার্কের চেহারাটা কল্পনা করলে মনে হবে যেন একটা মাকড়সার জাল, যাকে ইংরেজিতে বলে Cobweb (কবওয়েব) । তার থেকে এসেছে **World Wide Web** (ওয়ার্লড ওয়াইড ওয়েব) কথাটা, যার সংক্ষিপ্ত আকার হল, **www** ।

একটা কমপিউটার সাথে আরেকটা কমপিউটারের যোগাযোগটা বাহিত হয় **Telecommunication** (টেলিকমিউনিকেশন) ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেমন টেলিফোন ব্যবস্থা দিয়ে। পূর্বে, এই ব্যবস্থা উদ্ভবের প্রাথমিক পর্যায়ে, যোগাযোগটা বাহিত হতো টেলিফোন তারের মাধ্যমে, শব্দতরঙ্গ দিয়ে। আজকাল বাহিত হয় ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা সংক্ষেপে **Spectrum** (স্পেকট্রাম) দিয়ে। টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে তথ্য পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে এই স্পেকট্রামের ক্ষমতাও উন্নত হয়েছে, যাকে বলা হয় 2G, 3G, 4G ইত্যাদি। 2G, 3G, 4G ইত্যাদির G দিয়ে বোঝানো হয় পরবর্তী প্রজন্ম বা Generation (জেনারেশন)। আসলে এইগুলো কিন্তু তথ্য পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে বেতারতরঙ্গের বিভিন্ন **Band-Width** (ব্যান্ড-উইড্থ)। এর মাধ্যমেই চলে মোবাইল ফোনের যোগাযোগের নেটওয়ার্কগুলো। মোবাইল ফোন ছাড়াও এই দ্রুত তথ্য পরিবহনের পরিষেবা **Broadband** (ব্রডব্যান্ড) নামে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আজকাল যারা ইন্টারনেট কানেক্শন দেয়, মূলত টেলিফোন কোম্পানিগুলো ও টেলিভিশনের কেব্‌ল অপারেটররা, তারা ব্যবহার করছে আগেকার টেলিফোনের তারের বদলে অপ্টিকাল ফাইবারের তার। এদেরকে বলে **ISP (Internet Service Provider)** (আইএসপি–ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডর) বা Internet Access Provider (ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রোভাইডর)।

ইন্টারনেট কানেক্শন

ইন্টারনেট ব্যবহারকারি হিসাবে ইন্টারনেটে ঢুকতে বিশেষ কিছুই জানতে হবেনা, শুধু দুটো ব্যবস্থা করে নিতে হবে কমপিউটারে। একটা হল কমপিউটারে ইন্টারনেটের

কানেক্শন পাওয়ার ব্যবস্থা আর অন্যটা হল একটা ইন্টারনেট **Web Browser** (ওয়েব ব্রাউসার) প্রোগ্রাম।

ইন্টারনেট কানেক্শন পাওয়া যাবে স্থানীয় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি থেকে। কমপিউটার এই কানেক্শনটা ব্যবহার করতে পারে, যদি তাতে **NIC (Network Interface Controller)** (নিক–নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কন্ট্রোলার) লাগানো থাকে। টেলিফোন বা **DSL (Digital Subscriber Line)** (ডিএসএল–ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন) দিয়ে যুক্ত করতে আরও লাগে **Ethernet Port** (ইতারনেট পোর্ট)। অথবা, **Wifi (Wireless Fidelity)** (ওয়াইফাই–ওয়্যারলেস ফাইডলিটি) দিয়েও কানেক্শনটা কমপিউটারে আনা যায় যদি সেটার Wifi সিগ্ন্যাল ধরার ব্যবস্থা থাকে। ল্যাপটপ কমপিউটারে এর সবগুলোই থাকে ও আজকাল ডেসকটপ কমপিউটারেও এগুলো দেওয়া থাকে।

শুধুমাত্র ইন্টারনেট ব্যবহারকারির এত প্রযুক্তিগত কথা মনে না রাখলেও চলে। কিন্তু এই কানেক্শনের বিষয়টা আরও একটু জানার জন্য উল্লেখ করতে হয় **Modem** (মডেম) ও **Router** (রাউটার) ব্যবহার। ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় ইন্টারনেট কানেক্শন নিলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি দিয়ে যাবে তারের সাথে যুক্ত একটা মডেম। এরপরের কাজ হল ইতারনেট কেব্ল দিয়ে মডেমটাকে কমপিউটারের সাথে লাগানো, অথবা Wifi দিয়ে কানেক্শনটা কমপিউটারে পাওয়া।

মডেম কথাটা পুরো হল মডিউলেটর-ডিমডিউলেটর। এটা কমপিউটারের তথ্য পরিবহন বা দেওয়া ও নেওয়ার কাজ করে। অতীতে Modem টেলিফোন লাইনের কমপিউটারের ডিজিটাল তথ্যকে শব্দতরঙ্গে মডিউলেট করে পাঠাত, ও শব্দতরঙ্গকে ডিজিটালে ডিমডিউলেট করে কমপিউটারে আনত। সেই থেকে এই নামটা এসেছে। আজকাল মডেম হয় **ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line)** (এডিএসএল–অ্যাসিমেট্রিক ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন) ও তাতে Wifi সুবিধাও থাকে। অ্যাসিমেট্রিক বলার কারণ ADSL যে গতিতে তথ্য আনে, মানে **Download Speed** (ডাউনলোড স্পীড), তার থেকে কম গতিতে তথ্য পাঠায়, মানে **Upload Speed** (আপলোড স্পীড)।

একটা ইন্টারনেট কানেক্শন থেকে একই সাথে একাধিক কমপিউটারে ইন্টারনেট পাওয়ার ব্যবস্থা বা পথ করে দেয় রাউটার। আলাদা রাউটার ব্যবহার করলে সংযোগটা হয় মডেম থেকে রাউটারে ও তারপর রাউটার থেকে কমপিউটারে। একাধিক

কমপিউটারে কানেক্শনটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাউটারেই থাকে Wifi-য়ের ব্যবস্থা। আজকাল ঘরে ব্যবহারের সাধারণ মডেমের মধ্যেই রাউটার ও Wifi-য়ের ব্যবস্থা রাখা থাকে। এই ধরনের মডেম-রাউটারে সাধারণত একটা কানেক্শন থেকে একসাথে 10-20টা কমপিউটারে ইন্টারনেট পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, আর Wifi-য়ের সীমানা মোটামুটি 100-150 ফুট হয়। রাউটার-য়ের সংযোগ সংখ্যা ও Wifi-য়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে এই ব্যবস্থাকেই ব্যবহার করতে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস-বাড়িতে, শহরের বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ রেলওয়ে স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে। এর জন্য অবশ্য ইন্টারনেট কানেক্শনটাও উচ্চগতির হতে হয়।

শহরগুলোতে টেলিফোন কোম্পানিগুলো থেকে ইন্টারনেট কানেক্শন ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় পাওয়া গেলেও এখনও মফস্বল বা গ্রামে তা মেলে না। টেলিভিশনের স্থানীয় কেব্‌ল অপারেটাররা সেটা দিতেও পারে, কিন্তু তা অত্যাধিক খরচ সাপেক্ষ। এখানে ইন্টারনেট পাওয়ার উপায় হল মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক, যদি সেটা উচ্চ ক্ষমতার হয়। মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক কোম্পানিগুলোর থেকে পাওয়া যায় **SIM (Subscriber Identity Module)** (সিম–সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল কার্ড)। এটাকেই তারা ইন্টারনেট কানেক্শন দেওয়ার **Hotspot** (হটস্পট) নামে মডেম-রাউটার করে বিক্রিও করে। ব্রডব্যান্ড না থাকলে এর সাহায্যেও কমপিউটারে ইন্টারনেট কানেক্শন পাওয়া যেতে পারে, যদিও তার গতি অনেকটা কম হয়।

মোবাইল ফোনটা স্মার্টফোন হলে তাতে ইন্টারনেট কানেক্শন ও ব্রাউসার দেওয়াই থাকে। ডেসকটপ বা ল্যাপটপ কমপিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য কানেক্শন নিতে হয়। অবশ্য স্মার্টফোনকে হটস্পট করে নিয়ে তার ইন্টারনেট কানেকশনটাকে ল্যাপটপ কমপিউটারে ও ডেসকটপ কমপিউটারেও ব্যবহার করা যায় যদি সেটাতে Wifi সিগন্যাল ধরার ব্যবস্থা থাকে।

ইন্টারনেট ব্যবহার

একটা ইন্টারনেট কানেক্শন দেওয়ার সাথে সাথে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডর কোম্পানি তাদের **Server** (সার্ভার)-য়ে এই কানেক্শনটাকে একটা **IP Address (Internet Protocol Address)** (আইপি–ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস) দিয়ে চিহ্নিত করে নেয়, ও ব্যবহারকারিকে একটা **Login ID** (লগ্‌ইন আইডি) ও **Password** (পাসওয়ার্ড) দিয়ে দেয়। দীর্ঘ নম্বর দেওয়া এই আইপি অ্যাড্রেস, যেমন ধরা যাক 151.101.129.121, না জানলেও চলবে। এমন একটা নম্বর দিয়ে ইন্টারনেটের প্রত্যেক সংযোগকারিকেই চিহ্নিত করা থাকে। এটা একটা আন্তর্জাতিক

ব্যবস্থা। লগ্‌ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে যেকোনও কমপিউটার থেকেই ইন্টারনেট কানেক্‌শন পাওয়া যাবে, অবশ্য যদি সেই কমপিউটারে এর ব্যবস্থা থাকে। একে বলে ইন্টারনেট অ্যাক্‌সেস পাওয়া। এর ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারি লগ্‌ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্‌শন চালু করলেই, সংযোগ হবে সার্ভিস প্রোভাইডরের Server -এর সাথে, যাকে বলা হয় **Online** (অন্‌লাইন) হওয়া।

এরপর হল ইন্টারনেটে ঢোকা। ইন্টারনেটে আছে অসংখ্য **Website** (ওয়েবসাইট)। বিশ্বজুড়ে অসংখ্যা সংস্থা ও ব্যক্তিরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া বা জনসাধারণ থেকে তথ্য নেওয়ার জন্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইট তৈরি করে রাখে। এক একটা ওয়েবসাইটে থাকে এক বা একাধিক **Webpage** (ওয়েবপেজ), যা দেখা যাবে ওয়েবসাইটে ঢুকলে। এই ওয়েবসাইটগুলো রাখা থাকে কোনও না কোনও সার্ভারে, যেগুলো ছড়িয়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এগুলো হতে পারে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডরদের সার্ভার বা কোনও বড় ওয়েবসাইটের নিজস্ব সার্ভার ।

ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটগুলো পেতে কমপিউটারে একটা **Web Browser** (ওয়েব ব্রাউসার) প্রোগ্রাম রাখা চাই, যেমন **Google Chrome** (গুগ্‌ল ক্রোম), **Mozilla Firefox** (মোজিলা ফায়ারফক্স), **Internet Explorer** (ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার), ইত্যাদি। ব্রাউসার প্রোগ্রাম দিয়ে আসলে আমরা ঢুকি ব্রাউসারটার ওয়েবসাইটে। এটা চালালে যে অ্যাড্রেস বারটা পাওয়া যাবে সেখানে কিছু শব্দ লিখে সার্চ বা এন্টার করলে ব্রাউসার যে যে ওয়েবসাইটের পেজে শব্দগুলো পাবে তার একটা লিস্ট দিয়ে দেবে। এর যেকোনটাতে, এক একবারে একটা করে, ক্লিক করে ওই ওয়েবসাইটের পেজটাতে ঢোকা যাবে। অর্থাৎ, ব্রাউসারটার ওয়েবসাইটে থাকে একটা **Internet Search Engine** (ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন)। মনে রাখতে হবে, সার্চ করার শব্দগুলো যতদূর সম্ভব নির্দিষ্ট করে না দিলে কয়েক হাজার কোটি সার্চ রেজাল্ট এসে যেতে পারে, কারণ সার্চ ইঞ্জিন একটা একটা শব্দ আলাদা করে নিয়ে খোঁজে। কোনও নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছকে একত্রে খুঁজে পেতে হলে কোটেশন চিহ্ন দিতে হবে ।

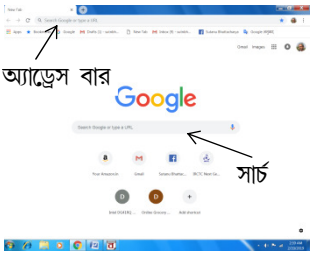

কোনও একটা ওয়েবসাইটে ঢোকার নির্দিষ্ট পথটা, যাকে বলে **URL (Unique Resource Locator)** (ইউআরএল–ইউনিক রিসোর্স লোকেটর) জানা থাকলে সেটা

ওয়েব ব্রাউসারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করে এন্টার করলে সরাসরি ওই ওয়েবসাইটে ঢোকা যাবে। URL-এর তিনটে অংশ। প্রথমে থাকে http:// বা https:// বা http://www., https://www.। http শব্দটা পুরো হল **hyper text transfer protocol** (হাইপার টেক্সট ট্রানসফার প্রোটোকল) আর শেষে "s" থাকলে বোঝায় **Secured** (সিকিয়োরড)। এরপর আসে **Domain Name** (ডোমেইন নেম) যার শেষে থাকে .in/, .net/, .com/, .edu/, ইত্যাদির কোনও একটা । শেষে থাকে ওই ওয়েবসাইটটার বিশেষ পেজে যাওয়ার পথটা। যেমন ধরো এই URLটা, http://www.bidyacharcha.com/index.html । এতে ওয়েবসাইটটার Domain Name নেম হল bidyacharcha.com ও শেষে index.html একটা ওয়েবপেজ বোঝাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট ব্যাপারটা কেমন করে চলে তা বুঝতে বুঝতে যারা আগ্রহী তাদের বিস্তারিত জানতে হবে IP Address, URL, Domain Name, **DNS (Domain Name Server),** ইত্যাদি সম্বন্ধে। আমরা এখানে সেই আলোচনা করব খুবই সংক্ষেপে। কিন্তু তার আগে দেখে নিই, একজন ব্যবহারকারি মূলত কী কী কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।

- Electronic mail— সর্বপ্রথম হল ইলেকট্রনিক মেল বা **Email** (ইমেল)। এর সাহায্যে একজন ইমেল ব্যবহারকারি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে অন্য একজন বা একাধিক ইমেল ব্যবহারকারিকে কোনও কিছু লিখে পাঠাতে পারে প্রায় তৎক্ষণাৎ। সেইসঙ্গে কমপিউটারে রক্ষিত কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ও মাপের বা সাইজের ফাইলও পাঠাতে পারে সংযোজন বা **Attachment** (অ্যাটাচমেন্ট) করে। ইমেল ব্যবহার করতে প্রথমে ব্যবহারকারিকে কোনও একটা **Email Service Provider** (ইমেল সার্ভিস প্রোভাইডর) পছন্দ করে নিয়ে তার ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে, যেমন **Google Mail** (গুগ্‌ল মেল), **Yahoo Mail** (ইয়াহু মেল), **Rediffmail** (রেডিফমেল) ইত্যাদি । এটা তৈরি হলে পাওয়া যাবে একটা লগ্‌ইন **Email ID** (ইমেল আইডি) ও তার **Password** (পাসওয়ার্ড), যেমন ধরা যাক, একটা ইমেল অ্যাকাউন্টের লগ্‌ইন ইমেল আইডি: arun.roy@gmail.com ও পাসওয়ার্ড: xyz4321। এই অ্যাকাউন্টটা আসলে থাকবে gmail.com ওয়েবসাইটটার সার্ভারে। পরবর্তীকালে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে এই লগ্‌ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিলে এই ইমেল অ্যাকাউন্টটা খুলবে ও দেখা যাবে কী কী ইমেল এসেছে, **Inbox** (ইন্‌বক্স), আর পাঠানো যাবে ইমেল অন্যান্য যেকোনও ব্যবহারকারিকে, যদি তার ইমেল আইডিটা জানা থাকে।

- Downloading files— বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে অডিও বা মিউজিক ফাইল, ভিডিও বা মুভি ফাইল, কোনও লেখা বা বইপত্র, প্রোগ্রাম ও ডিভাইস ড্রাইভার ফাইল, ইত্যাদি ডাউনলোড করে নিজের কমপিউটারে নিয়ে রাখা যাবে। এগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ফ্রী ডাউনলোড হিসাবে বা দাম দিয়ে কেনার জন্য রাখা থাকে। ডাউনলোড করার সময় বিশেষ সাবধানতা দরকার—অজানা সাইট থেকে ডাউনলোড করলে Malware বা Virus আসতে পারে, এমনকি তোমার ব্যাংক ইত্যাদি সংক্রান্ত গোপন তথ্যগুলোও তারা তুলে নিতে পারে। সাধারণ **http** ওয়েবসাইট ছাড়াও **ftp** (File Transfer Protocol) (এফটিপি–ফাইল ট্রানস্ফার প্রটোকল) ওয়েবসাইটও হয়, সম্পূর্ণ ফাইল দেওয়া-নেওয়া করার জন্য। আবার **Torrent** (টরেন্ট) ব্যবস্থায় একাধিক **Peers** (পিয়ার্স) সংযোগকারির কমপিউটার থেকে একটাই বড় ফাইলের টুকরো টুকরো অংশ ডাউনলোড করে নিয়ে একত্রিত ভাবে পেতে পারে **Leechers** (লীচার্স) সংযোগকারিরা।
- Education and self-improvement— মোটামুটি বলা যায় যে আজকাল ইন্টারনেট থেকে জানা যায় না এ হেন বিষয় নেই। তাই, বিভিন্ন বিষয়ে জানা ও শেখার জন্য ইন্টানেট ব্যবহার খুবই প্রচলিত। এমন কয়েকটা ওয়েবসাইট হল, Youtube, Wikipedia, Ted Talks etc.;
- Social Network friendship and Discussion groups— ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা আছে বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইটে, যেমন, Facebook, LinkedIn, etc.;
- Electronic newspapers and magazines— আজকাল সব বড় বড় খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকাই তাদের ওয়েবসাইটে অন্লাইন কপি রাখে। সুতরাং, এগুলো পড়ার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়;
- Research— উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় ইন্টারনেটের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে। কারণ বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যায় প্রকাশিত বই, গবেষণাপত্র, তথ্য ও পরিসংখ্যান ইত্যাদি, যেমন, Online Journals, Goglebooks, Research database, Jstor etc.;
- Interactive games— কমপিউটারে একলা ভিডিও গেম্স খেলার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও উত্তেজনার হল কয়েকজনে মিলে খেলা, যাদের চেনারও দরকার নেই। ইন্টারনেটে ইন্টারেকটিভ গেম্স এটা করে দেয়, যা কিশোরদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। এই ধরনের খেলার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে। কিন্তু এর বিপজ্জনক দিকও আছে। এক তো এটা প্রায় একটা নেশা হয়ে দাঁড়ায়, আর তার ওপরে কয়েকটা গেম্সের পরিণতি ভয়াবহ, যেমন, Blue Whale, PassOut, Salt and Ice etc.

ইন্টারনেট ব্যবস্থার পরিকাঠামো

এবার সংক্ষেপে একটা আন্দাজ করে নেওয়া যাক, ইন্টারনেট ব্যবস্থাটা কেমন করে চলে। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য সংযোগকারি দেখা যাচ্ছে দুই ধরনের—একদল, মূলত কিছু সংস্থা (অথবা ব্যক্তি), ইন্টারনেটে অন্য ব্যবহারকারিদের জন্য তথ্য রাখে (যাকে বলা হয় ওয়েবসাইট), আর অন্যদল ইন্টারনেট দিয়ে এই ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে। আমরা আগে বলেছি যে ইন্টারনেটে প্রত্যেকটা সংযোগ বা কানেক্শন হয় একটা নির্দিষ্ট নম্বর দিয়ে, যাকে বলে IP Address। সুতরাং তুমি ইন্টারনেট চালু করে অনলাইন হয়েছ একটা আইপি নম্বর হিসাবে ও কোনও ওয়েবসাইটে ঢুকেছ মানে আরেকটা আইপি অ্যাড্রেসে যুক্ত রাখা কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ করেছ, যেখানে ওই ওয়েবসাইটটার ফাইল, ফোল্ডার রাখা আছে। সুতরাং, IP Address-টা জানা থাকলে তুমি ইন্টারনেট দিয়ে যেকোনও কমপিউটারে ঢুকতে পারবে, আবার সেও পারবে তোমার IP Address দিয়ে তোমার কমপিউটারে ঢুকতে (যদিনা কোনও সিকিউরিটি প্রোটেক্শন নেওয়া থাকে)। ইন্টারনেটে সংযোগের শেষ দুই প্রান্ত হল এটা। কিন্তু এর মাঝে আরও কয়েকটা ধাপ আছে।

ওয়েবসাইটগুলো আসলে ইন্টারনেটে সংযুক্ত বিভিন্ন কমপিউটার বা সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস হলেও এদের প্রত্যেকটা আলাদা নাম দিয়ে রেজিস্টার করা থাকে, যাকে বলা হয় Domain Name । কারণ, অসংখ্য ওয়েবসাইটের অসংখ্য আইপি নম্বরটা দেখে না যাবে চেনা কোন্টা কোন্ ওয়েবসাইট, আর না যাবে নম্বরটা মনে রাখা বা প্রতিবার টাইপ করা। তাই ওয়েবসাইট করতে গেলে প্রথমেই তার একটা নাম রেজিস্টার করতে হয়। এটা করা হয় **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)** নামে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায়। এর উদ্দেশ্য হল, যাতে Domain Name দিয়ে একটামাত্র নির্দিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তির ওয়েবসাইট বোঝানো যায়। কিন্তু নানা দেশের নানা ভাষায় লেখা Domain Name থেকে তো IP Address-টাতে আসতে হবে। সেটা হয় DNS দিয়ে, যার কথা এরপরেই বলা হবে।

ওয়েবসাইট তৈরির এর পরের ধাপ হল ওয়েবপেজ ইত্যাদিসহ ওয়েবসাইটটা বানানো বা ডিসাইন করা ও একটা **Web Hosting Service Provider** (ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস প্রোভাইডর) থেকে **Server** (সার্ভার) ভাড়া নেওয়া, যেখানে রাখা হবে ওয়েবসাইটটার ফাইল, ফোল্ডারগুলো। এই সার্ভারটার অবশ্যই একটা IP Address আছে, যেটা **ICANN**-কে জানাতে হবে ওয়েবসাইটটা চালু করতে।

দেশে দেশে সার্ভার ভাড়া দেওয়া একটা বড় ব্যবসা, যেগুলোকে বলে **Server Farm**। বড় বড় ওয়েবসাইট (যেখানে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার সংযোগ ঘটে) বিভিন্ন দেশে তাদের নিজস্ব বা ভাড়া করা সার্ভার রাখে, যাতে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে না পড়ে, আর দ্রুতগতিও বজায় থাকে। একটামাত্র সার্ভার রাখলে তো হাজার হাজার সংযোগকারির লাইন লেগে যাবে ও সার্ভার কানেক্শনের গতিও কমে যাবে। তাছাড়া সংযোগকারির থেকে বেশি দূরত্বও সংযোগের গতি কমিয়ে দেয়। এইসব ওয়েবসাইটের Domain Name-য়ের সাথে তাই একাধিক সার্ভারের IP Address পাওয়া যায়। ব্যবহারকারির সংযোগটা হয় তার সবচেয়ে নিকটের IP Address টাতে।

ইন্টারনেট ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হল **Domain Name Server (DNS)**। এগুলোর কাজ হল, সংযোগকারির দেওয়া URL-য়ে যে Domain Name আছে তাকে তার নির্দিষ্ট IP Address-য়ে অনুবাদ করে দেওয়া, ও সংযোগটাকে ওই IP Address-য়ে পাঠিয়ে দেওয়া। এই DNS গুলোর সাথে সংযোগ করার জন্য প্রত্যেকটাকে দুটো করে নম্বর দেওয়া থাকে, একটা হল **Primary DNS Number** (প্রাইমারি ডিএনএস নম্বর) আর অন্যটা হল **Secondary DNS Number** (সেকেন্ডারি ডিএনএস নম্বর), যেটা কাজ করে কোনও কারণে প্রাইমারি নম্বরটা কাজ না করলে।

কোনও একটামাত্র DNS-য়ে সারা বিশ্বের যাবতীয় ওয়েবসাইটের Domain Name ও IP Address গুলো রাখা অসম্ভব। সে এক বিশাল ব্যাপার হয়ে যাবে, ও তার সাথে চট করে সংযোগ করাও অসম্ভব হবে না, আর কেই বা এটা করবে। তাই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে অনেকগুলো DNS তৈরি হয়ে আছে, যার বড় বড় কয়েকটা হল পাবলিক বা ফ্রী অ্যাকসেস, আর অন্যগুলো হল প্রাইভেট, যেগুলো রাখে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস প্রোভাইডর কোম্পানিগুলো (এখানে যেমন, BSNL, Airtel, Vodafone, Jio ইত্যাদি) । বড় বড় ওয়েবসাইটগুলো নিজস্ব DNS রাখে তাদের গ্রাহকদের IP Address গুলোতে ইন্টারনেট অ্যাকাউন্ট করে দেওয়ার জন্য।

এবার প্রশ্ন হল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা DNS গুলো থেকে কোনও একটা Domain Name-য়ের IP Address টা পাওয়া যাবে কী করে — কোনও DNS-য়েই তো সব Domain Name আর IP Address-য়ের তথ্য রাখা নেই। এটা হয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। DNS গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকে। ধরা যাক কোনও একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারি একটা URL দিয়ে সেই ওয়েবসাইটে ঢুকতে চাইছে। এবার যে DNS-য়ে এটা এসেছে তার ভাণ্ডারে ওই Domain Name-য়ের

IP Address টা না থাকলে সে ওটা পাঠিয়ে দেবে আরেকটা DNS-য়ে। সেখানেও না থাকলে সে আবার পাঠাবে আরেকটা DNS-য়ে।

এটা অনেকটা টেলিফোনের কল্ ফরোওয়ার্ডিংয়ের মতো। IP Address টা পাওয়া গেলে সংযোগটা চলে যাবে সেই সার্ভারে রাখা ওয়েবসাইটে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খোঁজ পাওয়া না গেলে এটা বাতিল হয়ে যাবে ও সংযোগকারির ব্রাউসারে দেখাবে সাইট বা পেজ নট ফাউন্ড। আবার IP Address টা পাওয়া গেলেও যদি সেই সার্ভার ঢিমে বা স্লো হয় তাহলেও বাতিল হয়ে দেখাবে সাইট নট রেসপন্ডেড। যে ওয়েবসাইট সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, সেখানে ঢুকতে গেলে আসবে অ্যাক্সেস ডিনায়েড। আবার, যেহেতু ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের প্রথম সংযোগটা সাধারণত হয় দেশের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডরদের DNS দিয়ে, তাই দেশের সরকার চাইলে বিশেষ কিছু ওয়েবসাইটে ঢোকা বন্ধও করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে DNS গুলোকে নির্দেশ দিয়ে। এক্ষেত্রে সংযোগকারিরা মেসেজ পাবে, নট অথরাইজড টু অ্যাকসেস। অবশ্য এই ধরনের সরকারি বাধাকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারিরা অতিক্রম করতেই পারে, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডরদের DNS-য়ের বদলে সরাসরি দেশের বাইরে অন্য কোনও পাবলিক বা ফ্রী অ্যাকসেস DNS-কে ব্যবহার করে। এটা করার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে।

কোনও সংযোগকারি কোনও একটা ওয়েবসাইটে বার বার ঢোকার সময় প্রতিবারই যে DNS মারফৎ এই IP Address খোঁজাখুঁজির প্রক্রিয়াটা চলে তা নয়। দ্রুত সংযোগ করে দিতে সংযোগকারির কমপিউটারেই **Browser Cache** (ব্রাউসার ক্যাশএ) হিসাবে গুলো সঞ্চিত হয়ে যায়। আবার ওয়েবসাইটগুলোও সংযোগকারিদের সাথে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে তাদের IP Address গুলো সঞ্চিত রাখতে পারে **Server Cache** (সার্ভার ক্যাশএ) হিসাবে।

এবারে সারসংক্ষেপ করা। মোবাইল স্মার্টফোন, হটস্পট, বা ব্রডব্যান্ড মডেম-রাউটার মারফৎ ইন্টারনেট কানেক্শন নিলেই সার্ভিস প্রোভাইডর একটা IP Address দিয়ে সেটাকে সংযোগ করে দেবে তার DNS সার্ভারে। কানেক্শনের মোবাইল, হটস্পট বা মডেম-রাউটারেই এই DNS-টা দিয়ে রাখা হয়। সুতরাং, কানেক্শনটা চালু করে অনলাইন হলেই সেটা যাবে ওই সার্ভারে। এবার সংযোগকারি তার ব্রাউসার প্রোগ্রাম, ধরা যাক Google Chrome চালু করলেই এই সার্ভার সংযোগটা পাঠাবে Google.com-য়ের IP Address অনুযায়ী সেই সার্ভারে। এরপর সংযোগকারি তার ব্রাউসারে কোনও URL টাইপ করলে গুগল সার্ভার DNS মারফৎ IP Address টা খুঁজে নিয়ে পাঠাবে সেই সার্ভারে, ও সংযোগকারি পেয়ে যাবে ওয়েবসাইটটা।

সমগ্র ইন্টারনেট ব্যবস্থাটার পরিকাঠামো, যেমন বিভিন্ন প্রোটোকল—IP, http, Ftp ইত্যাদি, আর Domain Name, ICANN, Domain Name Server ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, কোনও ব্যবসায়িক সংস্থার মুনাফাভিত্তিক উদ্যোগে নয়, বিশ্বের বহু ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যোগে। এটাই ইন্টারনেটের বিশেষত্ব।

সংযোজন 2. কমপিউটার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান

কমপিউটার চলে Electricity (ইলেক্ট্রিসিটি) বা বিদ্যুৎ দিয়ে, আর কাজ করে **Electronic** (ইলেকট্রনিক) বা বৈদ্যুতিন উপায়ে যাবতীয় তথ্যকে ও নির্দেশকে **Digital (ডিজিটাল)** করে নিয়ে। কমপিউটার সব তথ্যকেই তার চেনা ও কাজ করার জন্য রূপান্তরিত করে নেয় সংখ্যার **Binary System** (বাইনারি সিস্টেম) দিয়ে, যা কেবল 0 আর 1, মাত্র এই দুটো অঙ্ক বা ডিজিট ব্যবহার করে। বাইনারি বলতে আমরা বোঝাই যার দুটোমাত্র অবস্থা হয়—যেমন, হ্যাঁ বা না, আছে বা নেই। তাই, কমপিউটার করে কী—বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তরঙ্গ এলে ধরে 1 আর না এলে ধরে 0।

Codification System (কোডিফিকেশন সিস্টেম)

যাবতীয় তথ্যকে আমরা হয় ভাষায়, সংখ্যায়, অথবা ছবি বা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি। কমপিউটার করে কী—এগুলোকে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহার করে বুঝে নেয় মাত্র ওই দুটো বাইনারি ডিজিট দিয়ে। এর জন্য দরকার হয় **Codification System** (কোডিফিকেশন সিস্টেম)। এই কোডিফিকেশন সিস্টেমটা আমরা আগে থেকে ঠিক করে দিই ও তার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যাবতীয় তথ্য কমপিউটার **Encoding** (এনকোডিং) করে নেয় । তারপর **Encode** (এনকোড) করা তথ্যগুলোকে আমাদের প্রয়োজন মতো আবার আমাদের দেখায় **Decode** (ডিকোড) করে। এই কাজটা কমপিউটারে হয় অতি দ্রুতভাবে।

ধরা যাক একটা গান বা মিউজিক। এটা আর কিছু নয়, আমরা শুনতে পাই এমন কিছু শব্দতরঙ্গ নানাভাবে সাজানো। কমপিউটার কোডিফিকেশন সিস্টেম অনুযায়ী শব্দতরঙ্গগুলোকে এনকোড করে নেয় (শব্দতরঙ্গ এককোড করার নানারকম সিস্টেম বা সাউন্ড ফরম্যাট হয়, যেমন wav, avi, mp3, ইত্যাদি)। তারপর আমরা যখন গানটা শুনতে চাই, তাকেই আবার ডিকোড করে শব্দতরঙ্গ হিসাবে আমাদের শুনিয়ে দেয়। শোনার জন্য অবশ্য কমপিউটারে সাউন্ড আউটপুট ডিভাইস লাগাতে হবে, আর লাগবে সাউন্ড প্লেয়ার প্রোগ্রাম, যা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এনকোড করা কমপিউটারের তথ্যকে ডিকোড করে শব্দতরঙ্গ হিসাবে সাউন্ড আউটপুট আমাদের শোনাতে পারে।

ধরা যাক, আমরা কীইবোর্ড দিয়ে টাইপ করে ভাষা ও সংখ্যায় কিছু লিখছি। এটা কমপিউটারে এনকোড করা হয়ে যাবে দুটো ধাপে। প্রথম হল, আমাদের লিখিত ভাষায় ব্যবহার করা যাবতীয় বর্ণকে এনকোডিং করা থাকে **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) বা **Unicode** সিসটেমে। সুতরাং, আমরা যা কিছুই টাইপ করি, তা কমপিউটারে যায় এই কোড হিসাবে। ASCII কোডে 256টা কোড ব্যবহার হয় যেমন, **K** হল 75, আর হল **k** 107 । এইভাবে সবকটা বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, যা ব্যবহার হতে পারে, ও মাউস বা কীইবোর্ড দিয়ে যা কিছু করা হতে পারে, তাকে ASCII (বা Unicode) সিসটেমে কোডিফাই করা রাখা থাকে, আর কমপিউটারে সেসব ঢোকে ওই কোড অনুসারে। কমপিউটার এরপরের কোডিফিকেশনটা করে নেয়, ASCII (বা Unicode) কোডগুলোকে তার বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করে, কারণ কমপিউটার কাজ করে বাইনারি ডিজিট ব্যবহার করে।

Digit (ডিজিট) কথাটার মানে অঙ্কের এক একটা বর্ণ। যেমন, 7032 সংখ্যাটায় 4টে অঙ্ক বা ডিজিট আছে। সংখ্যা লেখার **Binary System** (বাইনারি সিস্টেম) মাত্র দুটো ডিজিট ব্যবহার করে, 0 আর 1। একে বলে Base 2 (বেস টু) । **Decimal System** (ডেসিমাল সিস্টেম) 10টা ডিজিট ব্যবহার করে, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9। এর বেস Base 10। **Octal** (অক্টাল) সিস্টেমে 8টা ডিজিট বা অঙ্ক থাকে, 0,1,2,3,4,5,6,7,8, যার বেস হয় 8। আজকাল ব্যবহার হয় **Hexadecimal** (হেক্সাডেসিমাল সিস্টেম) যেখানে 16টা অঙ্ক হয়। এখানে ডেসিমাল সিস্টেমের ডিজিট, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 আর ইংরেজির প্রথম 6টা বর্ণ A, B, C, D, E, F-কেও এক একটা ডিজিট হিসাবে ধরে মনে করা হয়, 10, 11, 12, 13, 14, 15। এর বেস 16। নিচের সারণিতে এই কোডিফিকেশন ব্যবস্থার খানিকটা অংশ দেখানো আছে—

ASCII	Decimal	Hexadecimal	Octal	Binary
[	91	5B	133	1011011
\	92	5C	134	1011100
]	93	5D	135	1011101
a	97	61	141	1100001
b	98	62	142	1100010
c	99	63	143	1100011
d	100	64	144	1100100

কমপিউটারের পরিমাপ — Measurement Units

তথ্য পরিমাপের ইউনিট বা একক হল **Bit (বিট)**। বাইনারি সিসটেমের এক একটা ডিজিট হল এক একটা bit। এটাই প্রচলিত হয়ে গেছে যে 8টা bit-কে ধরা হবে 1 **Byte (বাইট)**। এর বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই, তবে বাইনারি সিসটেমের সাথে সাযুজ্য রেখে base 2 ধরে নিয়ে আমরা 1 byte-কে লিখতে পারি 2^3 bit। কমপিউটার জগতে ক্রমশ তথ্য বেড়ে চলেছে আর তাই ক্রমশ পরিমাপের বৃহত্তর একক ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। বাইনারি সিসটেমে তথ্য পরিমাপের এককগুলো হল—

1 byte = 8 bits.
1 kilobyte (Kb) = 2^{10} bytes = 1,024 bytes.
1 megabyte (MB) = 2^{20} bytes = 1,048,576 bytes.
1 gigabyte (GB) = 2^{30} bytes = 1,073,741,824 bytes.
1 terabyte (TB) = 2^{40} bytes = 1,099,511,627,776 bytes.

এরপর এইভাবেই আসে, Peta Byte =2^{50} bytes, Exa Byte=2^{60} bytes, Zetta Byte=2^{70} bytes, Yotta Byte=2^{80} bytes.

তথ্য সঞ্চয় করার **Storage Device** (স্টোরেজ ডিভাইস)-গুলোর ক্ষমতা বা সাইজ মাপা হয় এই এককগুলো ব্যবহার করে যেমন, 500 GB, বা 2 TB হার্ডডিসক, 16 GB পেন ড্রাইভ, 4 GB ডিভিডি, ইত্যাদি। তথ্য পরিবহনের গতি মাপা হয় **bps** (বিপিএস) বা **bit per second** (বিট পার সেকেন্ড) দিয়ে। উচ্চতর গতি হলে মেট্রিক সিসটেমেই লেখা হবে **Kbps, Mbps**। অনেক সময় ইন্টারনেটে ফাইল ডাউনলোড করার সময় দেখায় **KBps, MBps**। ডাউনলোড করা ফাইলের সাইজের সাথে তুলনার জন্য এটা কিন্তু বোঝায় **byte per second** (বাইট পার সেকেন্ড)।

কমপিউটার প্রসেসরের গতি মাপা হয় **Hertz** (হার্টজ) দিয়ে। **Hertz** এককটা ব্যবহার হয় তরঙ্গ, যা **Cycle** (সাইক্‌ল্) হিসাবে চলে, প্রতি সেকেন্ডে তার সংখ্যা মাপার জন্য। কমপিউটার প্রসেসর কাজ করে বৈদ্যুতিন তরঙ্গ দিয়ে। তাই তার কাজ করার গতি নির্দিষ্ট করা হয় এই **Hertz** বা সংক্ষেপে **Hz** দিয়ে —যেমন, 2 GHz মানে হল 2 billion cycles per second।

কমপিউটারের মূল ব্যবস্থা — Basic Hardware System

কমপিউটারকে আমরা কিছু নির্দেশ দিয়ে বলি এটা করো, ওটা করো, আর সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোও দিয়ে দিই। এই নির্দেশ পেলে কাজটা করে **Processor** (প্রসেসর)। আর তারপর আমাদের ফেরৎ দেয়, ফলটা যা পেল সেটা। তথ্য ও নির্দেশ

যা প্রসেসরে ঢোকানো হল সেগুলো হল **Input** (ইনপুট), আর প্রসেসর কাজটা করে যা বার করে দিল, সেগুলো হল **Output** (আউটপুট)। মূল ব্যাপারটা এই ছবির মতো—

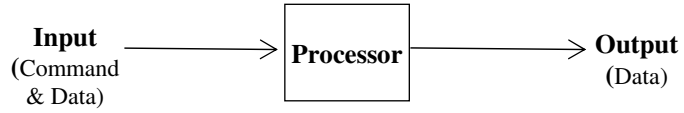

প্রসেসর হল **Logical Operator** (লজিকাল অপারেটর) যে শুধু যুক্তি অনুসারে কাজ করে । নির্দিষ্ট সময়ে কত বেশি তথ্য নিয়ে কত দ্রুত জটিল থেকে জটিলতর যুক্তি প্রয়োগ করে একটা কাজ করে দিতে পারে সেটাই হল প্রসেসরের ক্ষমতা।

ব্যাপারটা মূলত এটা হলেও আরও কিছু ব্যবস্থা দরকার। সেইগুলো আমরা দেখব একটা একটা করে—

1. ইনপুটগুলো দেব কী করে, যা প্রসেসর নিতে পারবে, আর প্রসেসর আউটপুটটাই বা দেবে কী করে। সুতরাং, লাগবে কিছু ইনপুট দেওয়ার আর আউটপুট নেওয়ার মাধ্যম, যাকে বলে Input Device (ইনপুট ডিভাইস) আর Output Device (আউটপুট ডিভাইস)। আপাতত ধরা যাক, ইনপুট ডিভাইস হল Keyboard (কীবোর্ড) ও Mouse (মাউস), আর আউটপুট ডিভাইস হল একটা Display Monitor (ডিসপ্লে মনিটর);
2. এই ডিভাইসগুলোকে প্রসেসরের সাথে জুড়ে রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে লাগবে একটা বোর্ড, যেখানে প্রসেসরটা থাকবে ও ডিভাইসগুলো লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে । এই বোর্ডটাকে বলব **Motherboard** (মাদারবোর্ড);
3. এর পরের সমস্যা হল প্রসেসর চিনবে কী করে কোন্‌টা ইনপুট নেওয়ার আর কোন্‌টা আউটপুট দেওয়ার ডিভাইস। সুতরাং প্রথমেই এটা প্রসেসরকে বলে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটা কীভাবে করা যাবে? এর জন্য ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম লিখে স্থায়ীভাবে মাদারবোর্ডে রাখতে হবে, যেটা চালিয়ে প্রসেসরকে বলে দেওয়া যাবে বোর্ডের কোথায় কোন্ ডিভাইসটা লাগানো আছে, কোন্‌টা কী ধরনের ইনপুট ডিভাইস আর কোন্‌টা কী ধরনের আউটপুট ডিভাইস। এটাকে বলে **BIOS (Basic Input Output System)** (বায়োস–বেসিক ইনপুট আউটপুট ডিভাইস)। এই প্রোগ্রামটা স্থায়ীভাবেই রাখতে হবে, কারণ এটাতে গন্ডগোল হয়ে গেলে সবটাই যাবে। এই

কারণে এটা যেখানে রাখা থাকে ও আপনি চালু হয় তাকে বলে **ROM (Read Only Memory)** (রম্–রীড ওন্‌লি মেমরি);

4. কিন্তু প্রতিবার কমপিউটার চালালেই কী **ROM**-য়ে রাখা এই প্রোগ্রামটাকে প্রথমে চলতে হবে ও তবেই প্রসেসর জানতে পারবে **BIOS**-টা কেমন। এটা হলে তো কিছু সময় নষ্ট। তাই **BIOS** তথ্যকে সঞ্চয় করে রাখার একটা ব্যবস্থা করা হল, যাকে বলে **CMOS** (সিমোস)। বিদ্যুৎ না থাকলে তো এই তথ্যটা উড়ে যাবে, তাই এর সাথে রাখা হল একটা ছোট ব্যাটারি। এটা হল **CMOS Battery** (সিমোস ব্যাটারি)।

এই পর্যন্ত আমরা যা পেলাম তা নিচের ছবিতে দেওয়া হল—

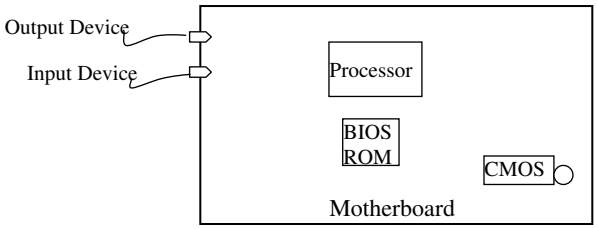

কিন্তু কাজ করার ব্যবস্থায় এখনও কিছু অভাব রয়েছে। আরও কিছু ব্যবস্থা দরকার।

5. প্রসেসর তো কেবল যুক্তি দিয়ে কাজ করবে। তার তো কাজ করার একটা জায়গা চাই, যেখানে সে সাময়িকভাবে **BIOS** তথ্যটা নিয়ে রাখবে, ইনপুট দেওয়া সবকটা তথ্য ও নির্দেশগুলো রাখবে, তারপর ধাপে ধাপে যুক্তির প্রক্রিয়ায় কাজটা করবে, ও শেষে আউটপুট তৈরি করে আউটপুট ডিভাইসে পাঠাবে। এই জায়গাটা অনেকটা স্লেট-পেনসিলে লেখার জায়গার মতো — বার বার লিখবে আর মুছবে। এর ব্যবস্থা হল **RAM (Random Access Memory)** (র‍্যাম-র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমরি)। এটা যথেষ্ট না হলে বড় বড় কাজ আদৌ করা যাবে না, বা কাজটা হবে ঢিমেতালে, একটু একটু করে। নামটা প্রায় একরকম বলে রম্ আর র‍্যাম গুলিয়ে যায়। রমকে বলে **Non-volatile** (নন্-ভোলাটাইল মেমরি) যা স্থায়ীভাবে রাখা থাকে, আর র‍্যাম হল **Volatile** (ভোলাটাইল মেমরি), যেখানে প্রসেসর ক্রমাগত তথ্য রাখে আর মোছে, এবং কমপিউটার বন্ধ করলে সেখান থেকে সব মুছে যায়;
6. এরপরের সমস্যা হল এক একবার কাজ করার জন্য যেসব তথ্য ও নির্দেশ দেওয়া হবে আর আউটপুট যা পাওয়া যাবে, তাকে কোথাও ধরে রাখা দরকার। নয়ত,

কমপিউটার বন্ধ করলেই, বা পরের কাজটা করতে গেলেই, এই কাজের সবটাই মুছে যাবে। এর জন্য উপায় হল Storage Device (স্টোরেজ ডিভাইস)। ধরা যাক আপাতত আমরা একটা Hard Disk Drive (হার্ডডিসক ড্রাইভ) আর DVD Drive (ডিভিডি ড্রাইভ) লাগাব, যাতে প্রসেসরকে প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিয়ে বলা যায় যে ওই ড্রাইভ থেকে নির্দেশ ও তথ্য নাও এবং আউটপুটকে ওখানে নিয়ে জমা বা সেভ করে রাখো। বোঝাই যাচ্ছে BIOS-কে এই ড্রাইভগুলোর তথ্যও তুলে রাখতে হবে;

7. বাকি রইল আর একটা জিনিস। কমপিউটার চলে বিদ্যুৎ দিয়ে। এতগুলো ডিভাইস বা অংশের বিভিন্ন পরিমানের বিদ্যুত বা ভোল্ট প্রয়োজন। সেটা তাই ভাগ করে দিতে চাই আরেকটা ব্যবস্থা, যাকে বলে **SMPS** (Switched-Mode Power Supply) (এসএমপিএস– সুইচ্ড-মোড পাওয়ার সাপ্লাই)।

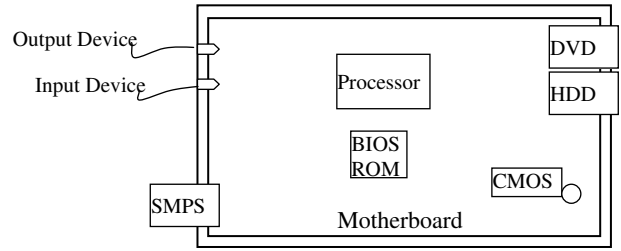

এই নিয়ে হল কমপিউটারের মূল ব্যবস্থা। Processor, ROM (BIOS), RAM, CMOS, ইত্যাদি Motherboard-য়ে লাগিয়ে, বোর্ডটাকে লাগানো বা **Mount** (মাউন্ট) করা হয় একটা **Cabinet** (ক্যাবিনেট) বা যাকে **Chassis** (শ্যাসি) বলে। তাতে ঢোকানো হয় ও HDD/DVD ড্রাইভগুলো, **SMPS** ও সেগুলোর তার মাদারবোর্ডের ঠিক ঠিক জায়গাতে জোড়া হয়। এটুকু করলে আমরা পাই একটা ডেসকটপ পার্সনাল কমপিউটার **CPU** (সিপিইউ)-য়ের ন্যূনতম ব্যবস্থা । ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসগুলো মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট পোর্টে পরে লাগানো হয়।

এছাড়া অবশ্য আরও কিছু ছোটখাটো জিনিস জুড়তে হয়, যেমন **Cabinet Front Panel** (ক্যাবিনেট ফ্রন্ট প্যানেল)-য়ে রাখা **Power Button** (পাওয়ার বাটন), **Restart Button** (রিস্টার্ট বাটন), **HDD Light** (এইচডিডি লাইট), **Cabinet Speaker** (ক্যাবিনেট স্পীকার), **USB Port** (ইউএসবি পোর্ট) ইত্যাদি। **Sound Device** (সাউন্ড ডিভাইস), **Display Device** (ডিসপ্লে ডিভাইস),

Network Device (নেটওয়ার্ক ডিভাইস) ও **Wifi Device** (ওয়াইফাই ডিভাইস), আর এগুলোর প্রয়োজনীয় পোর্ট ও **USB** পোর্ট মাদারবোর্ডেই দেওয়া থাকে । চাইলে আরও ডিভাইস **PCI Slot** (Peripheral Component Interconnect) (পিসিআই স্লট)-য়ে লাগানো যায়, যেমন আরও ভাল সাউন্ড কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড, যদিও সাধারণ কাজে এগুলো লাগে না, কারণ মাদারবোর্ডেই এগুলো কাজ চলার মতো দেওয়া থাকে।

ডেসকটপ কমপিউটারের অংশগুলো—Assembled Parts

পুরো একটা ডেসকটপ কমপিউটার কোনও কোম্পানিই বানায় না। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন অংশ বা পার্টস বানিয়ে বিক্রি করে। এরা হল সেই পার্টসগুলোর **OEM** (Original Manufacturer) (ওইএম–ওরিজিনাল ম্যানুফ্যাকচারার)। কিছু কোম্পানি এগুলোকেই একত্রিত বা অ্যাসেম্বল করে তাদের নাম দিয়ে বাজারে বিক্রি করে ব্র্যান্ডেড ডেসকটপ কমপিউটার হিসাবে।

যে কেউ বাজার থেকে পার্টসগুলো কিনে নিজেই করে নিতে পারে। কীভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে ইন্টারনেটে বহু তথ্য ও হাতেকলমে করে দেখানোর ভিডিও মেলে। কিন্তু যেটা বিশেষ করে জানতে হয় সেটা হল, কোন্টার সাথে কোন্টা ঠিকঠাক লাগে ও চলে। কোন্টা কোথায় লাগবে তা মাদারবোর্ডের বিভিন্ন **Slot** (স্লট)-গুলোর পাশেই লেখা থাকে। যে তারগুলো জুড়তে হয় বোর্ডের পিনগুলোর ওপরে, সেগুলোর পাশে ও তারগুলোর মাথায় লাগানো **Jumper** (জাম্পার)-য়ে লেখা থাকে কোন্টা কোন্দিকে লাগাতে হবে—কোন্টা পজিটিভ আর কোন্টা নেগেটিভ। পরস্পরের সাথে ঠিকঠাক মেলে কিনা, এই প্রশ্নটা বিশেষ করে ভাবতে হবে Processor, Motherboard, ও RAM-কে নিয়ে, আর তাল মিলিয়ে ঠিক করতে হয় কত ক্ষমতার HDD নেব।

কমপিউটার প্রযুক্তি অতি দ্রুত পাল্টায়, ও একই অংশ নতুন প্রযুক্তিকৌশল নিয়ে তৈরি করা হয়। এর উদাহরণ অসংখ্য। আমরা তাই নিচে শুধু অংশগুলোর নামের তালিকা দেব। এখন বাজারে যা মেলে, সেই অনুযায়ী অংশগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিরর্থক। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তা পাল্টে যাবে।

1. Processor	2. Motherboard	3. RAM cards
4. HDD/SSD	5. DVD drive	6. SMPS
7. Cabinet/Chassis	8. Front Panel USB	9. Processor Fan
10. VGA Monitor	11. Keyboard	12. Mouse
13. CMOS Battery	14. SATA Cables	15. Power Cable
আর লাগবে, বলাই বাহুল্য, Cabinet/Drive লাগাবার কিছু Screws		

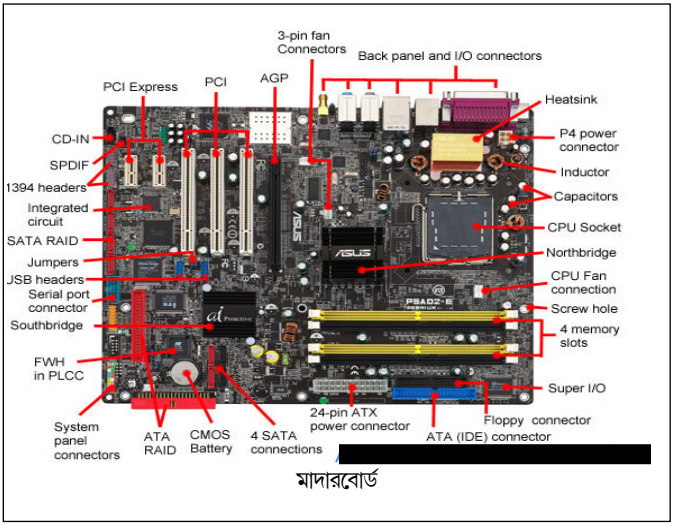

মাদারবোর্ড

এসএমপিএস

ক্যাবিনেট/শ্যাসি

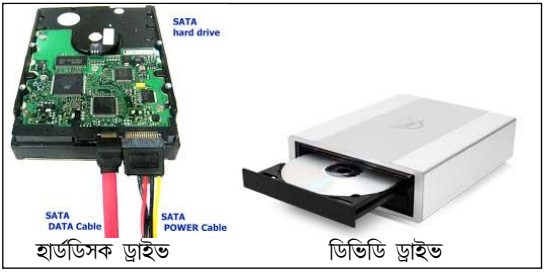

হার্ডডিসক ড্রাইভ

ডিভিডি ড্রাইভ

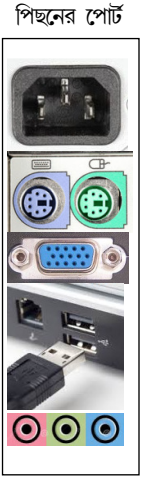

সব পার্টসই নতুন নিলে সমস্যা তেমন নেই। বর্তমানে নতুন Processor যা পাওয়া যায় সেগুলো সবই **64-bit** (Intel i3,i5,i7; AMD A6, A8, A10, A12)। এর সাথে মেলে এমন নতুন মাদারবোর্ড (Asus, Intel, AMD, Gigabyte) নিতে হবে। RAM অবশ্যই **ddr (ddr4)**, কম করে 4GB। আগেকার SDRAM চলবে না। ওটা অনেকদিন আগেই বাতিল হয়েছে। HDD 500GB হলেই চলে, কিন্তু 1 TB-র কম হয়তো মিলবে না। সম্প্রতি নতুন প্রযুক্তি হিসাবে SSD (Solid State Disk) (সলিড স্টেট ডিসক) আসছে। হার্ড ডিসক হল চলমান বা ঘূর্ণায়মান। SSD-র মধ্যে চলমান কিছু নেই। এটা অনেকটা USB Flash Storage (ফ্ল্যাশ স্টোরেজ)-এর মতো। এর দাম অনেক বেশি আর সমস্যাও আছে। বহুবার লেখা, মোছা বা ফরম্যাট করা হলে খারাপ হতে থাকে। HDD আর DVD drive হতে হবে **SATA** (Serial Advanced Technology Attachment)। আগেকার **PATA** (Parallel ATA) দিয়ে কাজ চলবে না। Front Panel USB 3.0 নিতে হবে।

পুরনো পার্টস ঠিকঠাক পাওয়া গেলে কম খরচে একটা কমপিউটার বানিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু দেখতে হবে পার্টসগুলো ঠিকঠাক মেলে কিনা। যেমন, Processor আগেকার **32-bit** (যেমন, Intel Core 2 duo) হলে মাদারবোর্ডও সেই অনুযায়ী নিতে হবে। এখানে RAM হবে ddr2, আর 4GB না হলেও চলবে। এখানে Wifi ও

HDMI display পোর্ট থাকে না। আলাদা করে নিতে হয় আর **Wifi dongle** (USB) নিয়ে ড্রাইভার ইনস্টল করতে হয়। এখানে USB 2.0 চলবে, USB 3.0 নয় । এর জন্য অপারেটিং সিসটেম 32-bit নেওয়াই ঠিক ।

কমপিউটারটা চালাতে এরপরের কাজ সফ্টওয়্যারের। প্রথমেই হার্ডডিসক পার্টিশন করে Operating Software (অপারেটিং সফ্টওয়্যার) ইন্স্টল করে নিতে হবে । মনে রাখতে হবে, Primary Active হবে C:, আর হার্ড ডিসক Format হবে New Technology File System (**NTFS**)। কিন্তু Pen Drive format হয় **FAT32**। (অপারেটিং সফ্টওয়্যার) ইন্স্টল করার পরেই মাদারবোর্ডের **Device Driver** (ডিভাইস ড্রাইভার)-গুলো একবার চালিয়ে ইন্স্টল করে নিতে হবে।

কীবোর্ড, মাউস, ডিসপ্লে মনিটর, এক্সটারনাল স্পিকার, ইত্যাদি আজকাল **Plug and Play** (প্লাগ অ্যান্ড প্লে ডিভাইস) করে নেওয়া হয়েছে। USB পোর্টে লাগানোর কীইবোর্ড ও মাউস পাওয়া যায়। কিন্তু **PS/2** কীইবোর্ড ও মাউস লাগে PS/2 পোর্টে ও সম্ভবত বেশি কাজের। PS/2 পোর্টে লাগানো কীবোর্ড ও মাউসের পোর্ট আলাদা রঙের হয়, ও এগুলোর **DIN Connector** (ডিন কানেক্টার) পিন ঠিকঠাক না ঢোকালে, বার বার এদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে চাপাচাপি করলে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এগুলো চালানোর প্রয়োজনীয় ডিভাইস ড্রাইভার অপারেটিং সফ্টওয়্যার নিজেই নিয়ে নেয় তার সঞ্চিত ড্রাইভারগুলো থেকে। অন্য কোনও ডিভাইস, যেমন প্রিন্টার, ক্যামেরা, অডিও সিসটেম, ইত্যাদি লাগালে দেখে নিতে হবে অপারেটিং সিসটেম তার উপযুক্ত ড্রাইভার নিজেই পেয়ে গেছে কিনা। না হলে ডিভাইসটার সাথে দেওয়া ইনস্টলেশন সিডি/ডিভিডি থেকে সেটা ইন্স্টল করতে হবে । প্রয়োজন হলে যাবতীয় ডিভাইস ড্রাইভার, অডিও ম্যানেজার ইত্যাদি সবই ইন্টারনেট থেকে নেওয়া যেতে পারে, ডিভাইসটার মডেল ঠিকঠাক জানা থাকলে। হার্ড ডিসক ফরম্যাট করা হলে এই ড্রাইভারগুলো উড়ে যায়। তাই সিসটেমটার যাবতীয় ড্রাইভার আলাদা করে সেভ বা **Back-up** (ব্যাক-আপ) নিয়ে রাখা উচিত।

সংযোজন 3. কমপিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ

কমপিউটার রক্ষণাবেক্ষণের দুটো ভাগ—যন্ত্রটা বা হার্ডওয়্যার ও ব্যবহৃত প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ। **হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণে** যন্ত্রটা ঠিকভাবে রাখতে হয় ধুলো, আর আর্দ্রতা থেকে বাঁচিয়ে, সম্ভব হলে ঢাকা দিয়ে কোনও শুকনো স্থানে। প্রিন্টার ব্যবহার করলে তা ঢাকা দিয়ে রাখা অবশ্যপ্রয়োজন। কমপিউটারে ঢাকা দেওয়া থাকলে ব্যবহারের সময় তা অবশ্যই খুলে নিতে হবে, যাতে হাওয়া চলাচল করতে পারে।

এরপর খেয়াল রাখতে হবে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেমন । বাড়িতে সাধারণত যে বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, তাতে কমপিউটার চালানোর অসুবিধা নেই। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, বিদ্যুৎ লাইনের **Earthing** (আর্থিং) বা **Ground Line** (গ্রাউন্ড লাইন) যেন ঠিকঠাক করা থাকে। কমপিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ সর্বদা করা উচিত আলাদা লাইন টেনে, যাতে অন্য কোনও বৈদুতিক যন্ত্র একই লাইনে না থাকে। এছাড়া, কমপিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য উচিত একটা **Surge Protector** (সার্জ প্রোটেক্টর) বা **Spike Buster** (স্পাইক বাস্টার) লাগানো। এটা অল্প খরচেই কিনতে পাওয়া যায়। আশেপাশে কোথাও বাজ পড়লে, বা বিদ্যুৎ সরবরাহে স্পাইক এলে এটা তা আটকাবে।

কমপিউটার নিয়মিত ব্যবহার করা দরকার। নিয়মিত ব্যবহারে না থাকলে কোনও কিছুই ঠিক থাকে না। এটা বিশেষ করে প্রিন্টার ও সিডি/ডিভিডির ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রিন্টারে কালি শুকিয়ে গেছে । সিডি/ডিভিডি ড্রাইভে একটা সিডি/ডিভিডি সর্বদা ভরে রাখলে ড্রাইভটার লেন্সে ময়লা পড়া আটকায়।

সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ বন্ধ করা উচিত, হাত দিয়ে না ঠেলে, ড্রাইভের সাথে দেওয়া খোলা ও বন্ধ করার টগল্ বোতামটা টিপে। পেন ড্রাইভ খুলে নিতে হলে আগে সিসটেম ট্রেতে পেন ড্রাইভ চিহ্নটা রাইট ক্লিক করে **Eject** (ইজেক্ট) করে নিতে হবে ও **Safe to Remove Hardware** (সেফ টু রিমুভ হার্ডওয়্যার) মেসেজটা এলে তবেই খুলতে হবে।

দীর্ঘকাল ব্যবহার না হলে সমস্যা আসে। সিপিইউ-য়েও একটা ছোট ব্যাটারি থাকে। কমপিউটার বন্ধ রাখলেও এটা থেকে একটা চার্জ থেকে যায় কমপিউটারের চলা আরম্ভের ন্যূনতম কিছু তথ্য ধরে রাখতে। দীর্ঘকাল না চালালে এটার আয়ু শেষ হয়ে যায় ও তখন **CMOS Checksum Error** (সিমোস চেকসাম এরার) দেয়, মানে চলার ওই ন্যূনতম তথ্য কমপিউটার পায় না। এক্ষেত্রে প্রতি বারই চালাবার সময় ডিফল্ট লোড করে নিতে হবে, সাধারণত কীবোর্ডের **F2** (এফ-২) টিপে।

কমপিউটারের আরম্ভের স্ক্রিনেই এটা বলা থাকবে। তেমন প্রয়োজন হলে এই ব্যাটারি কিনে এনে নিজেরাই পাল্টে নেওয়া যায়, ব্যাটারির ওপর ও নিচের দিক ঠিক রেখে।

কমপিউটার চালু হওয়ার সমস্যা যদি ঘটে, তা অধিকাংশ সময় দেখা যায় **RAM Card** (র‍্যাম কার্ড)-য়ের সংযোগগুলোতে ধূলো জমার সমস্যা। এটা হলে দেখা যাবে কমপিউটার চালু করলে **Boot** (বুট) করার **System Sound** (সিসটেম সাউন্ড) দীর্ঘায়িত হয়ে বার বার বেজে চলেছে ও কমপিউটার চালু হচ্ছে না। এর সহজ সমাধান হল মাদারবোর্ডের খোপটা থেকে র‍্যাম কার্ডটা খুলে নিয়ে কার্ডের ও খোপটার সংযোগগুলোকে শুকনো কাগজ ঘষে পরিষ্কার করে নেওয়া ও ঠিক ওইভাবে ওই খোপে বা পাশের খোপে আবার লাগানো। এরপরেও সমস্যাটা থাকলে বোঝা যাবে র‍্যাম কার্ডটাই খারাপ হয়ে গেছে ও সেটা আলাদা করে কিনে এনে লাগাতে হবে। নানা ধরনের র‍্যাম কার্ড (ddr1, ddr2, ddr3, ddr4, আর আগে ছিল, SDRAM) হয়। কমপিউটারটাতে লাগবে এমন র‍্যাম কার্ডই নিতে হবে।

কমপিউটার তৈরি হয় বিভিন্ন অংশ বা পার্টস জুড়ে। এই জোড়াগুলো ঠিকঠাক চেপে লাগানো না থাকলে হয়ত দেখা যাবে হার্ড ডিস্ক বা সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ কাজ করছে না, সাউন্ড সিসটেমে আওয়াজ আসছে না, ইত্যাদি। ঠিকভাবে লাগানো না থাকলে বা কোনও কারণে সংযোগটা ঢিলে হয়ে গেলে কমপিউটারে যুক্ত করা মনিটর, কীবোর্ড, মাউস, সাউন্ড সিসটেম ইত্যাদি কাজ নাও করতে পারে। তাই সমস্যা হলে আগে এটাই দেখে নিতে হবে। কিন্তু, জোর করে চাপাচাপি না করাই উচিত।

বিশেষ করে দেখা যায়, কমপিউটারের ক্যাবিনেটের সামনে রাখা **USB Port** (ইউএসবি পোর্ট) কাজ করছে না। এর কারণ, এগুলো ক্যাবিনেটের সাথেই দেওয়া থাকে ও পরে মাদারবোর্ডে জোড়া হয় তার দিয়ে। পিছনের ইউএসবি পোর্টগুলো মাদারবোর্ডের সাথেই থাকে, তাই খারাপ হতে দেখা যায় না। আজকাল **USB Extension Hub** (ইউএসবি এক্সটেনশন হাব) পাওয়া যায়, যা দিয়ে পেছনের একটা ইউএসবি পোর্ট থেকেই অনেকগুলো ইউএসবি পোর্ট পাওয়া যায়, ও সামনেই রাখা যায়। সিডি/ডিভিডি ড্রাইভও খারাপ হতে দেখা যায় প্রায়ই। সেক্ষেত্রে একটা উপায় হল একটা **External CD/DVD Drive** (এক্সটারনাল সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ) কিনে রাখা, যা ইউএসবি পোর্টে লাগানো যাবে। সিডি/ডিভিডি ড্রাইভের প্রয়োজন হয়, কারণ বিভিন্ন প্রোগ্রাম কেনার সময় ইনস্টলেশন ফাইল ও ড্রাইভারগুলো সিডি/ডিভিডিতে দেওয়া হয় । এছাড়া **System Repair Disk** (সিসটেম রিপেয়ার ডিসক) বা **Boot CD** (বুট সিডি) চালানোর জন্যও সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ লাগে। অবশ্য পেন ড্রাইভ দিয়েও বুট সম্ভব।

আলাদা করে কমপিউটার হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন অংশ বা পার্টসগুলো কিনে এনে জুড়ে যে কমপিউটার তৈরি হয় সেগুলোকে বলে **Assembled** (অ্যাসেম্বল্ড) কমপিউটার। এর সুবিধা হল, প্রয়োজন মতো বিভিন্ন পার্টস পাল্টানো যায় বাজার থেকে কিনে এনে । কোনও পার্টস খারাপ হলে সেটা মেরামতির চেষ্টা করা অধিকাংশ সময়ই নিরর্থক, ও সম্ভবও হয় না। যেমন প্রসেসর, মাদারবোর্ড, হার্ড ডিসক, মেরামত সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও তা এতই খরচ সাপেক্ষ যে নতুন কেনাটাই ভাল। সমস্যা হল, এই পার্টসগুলো যে লাগানোর মতো একদম ঠিকঠাক, বা উচ্চমানের হবে, তা নাও হতে পারে। অন্যদিকে যেসব কোম্পানি তাদের নাম দিয়ে, যাকে বলে **Branded** (ব্র্যান্ডেড), কমপিউটার বাজারে বিক্রি করে, সেগুলো উচ্চমানের হয়, খরচও বেশি। কিন্তু, সেগুলোর কোনও একটা পার্টস খারাপ হলে পাল্টানো বিশেষ সমস্যা হয়। বাজার থেকে কেনা পার্টস অধিকাংশ সময় এগুলোতে ঠিকঠাক লাগেনা। সেইমতো করেই কোম্পানিগুলো তাদের ব্র্যান্ডেড কমপিউটার বাজারে ছাড়ে।

কমপিউটার পরিষ্কার করার জন্য ধূলো ঝাড়া যেতে পারে। হাওয়ায় খুব বেশি ধূলো-ময়লা থাকলে বছরে একবার কমপিউটারের ক্যাবিনেট খুলিয়ে ভেতরে জমা ধূলো পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া উচিত। স্ক্রিন পরিষ্কার করতে সাবান বা কোনও কেমিক্যাল না দিয়ে অল্প ভিজে কাপড় দিয়ে সাবধানে হাল্কা মুছে নেওয়া যায়। পরিষ্কার করার সময় কমপিউটার নাড়াচাড়া করতে হতেই পারে। তাই দেখে রাখা ভাল, কীবোর্ড, মনিটর, মাউস, ইত্যাদি ক্যাবিনেটের পেছনে কোথায় কীভাবে লাগানো আছে।

সফ্টওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ

সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণে সর্বপ্রথম হল Operating System Software (অপারেটিং সিসটেম সফ্টওয়্যার) ঠিকঠাক রাখা। এটা প্রথমেই **Install** (ইনস্টল) করা হয় সেইসময়ই হার্ড ডিসক পার্টিশন করে **C:** ড্রাইভে ইনস্টল করা হয়। প্রতিবার কমপিউটার চালু হলেই এটা **C:** ড্রাইভ থেকে আপনি **Load** (লোড) করে নেয়। এই জন্য **C:** ড্রাইভকে বলা হয় প্রাইমারি অ্যাকটিভ ড্রাইভ। এছাড়া অন্য যে কোনও ব্যবহারিক প্রোগ্রামও সাধারণত **C:** ড্রাইভেই ইনস্টল করা হয় ।

সুতরাং, উচিত হচ্ছে আমাদের কাজের ফাইল ও ফোল্ডারগুলো, যা ক্রমাগত তৈরি করি ও মুছে ফেলি, এই **C:** ড্রাইভে নয়, অন্য কোনও পার্টিশনে রাখা। অন্যান্য ব্যবহারিক প্রোগ্রামগুলো নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ইনস্টল করা দরকার হতে পারে বলে এই **Program Installation** (প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন) ও **Device Driver** (ডিভাইস ড্রাইভার) ফাইলগুলোরও একটা করে কপি অন্য পার্টিশনে রেখে দেওয়া

ভাল। এর কারণ, কোনও কারণে অপারেটিং সিসটেম সফ্টওয়্যার আবার ইনস্টল করতে হলে **C:** ড্রাইভ **Format** (ফরম্যাট) করে তা করতে হবে। ফলে সেখানে যা কিছু ছিল সবই মুছে যাবে। তেমনটা ঘটলে প্রয়োজন মতো অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো ও ডিভাইস ড্রাইভারগুলোও আবার ইনস্টল করে নিতে হবে ।

Disk Clean Up (ডিসক ক্লিন আপ), **Defragment** (ডিফ্র্যাগমেন্ট), **System Restore** (সিসটেম রেসটোর)

নানা কারণে কমপিউটারের কাজের গতি ঢিমে হয়ে যেতে পারে ও **System Crash** (সিসটেম ক্র্যাশ) করতেও পারে। ক্রমাগত নতুন নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টল ও **Uninstall** (আন্ইনস্টল) করার ফলে **System Registry** (সিসটেম রেজিস্ট্রি)-তে অদরকারি **Registry Entry** (রেজিস্ট্রি এন্ট্রি) জমে যায়, অদরকারি ডিভাইস ড্রাইভার লোড হয়ে থাকে, টেম্পোরারি বা **Temp File** (টেম্প ফাইল) জমে যায়। এছাড়া ইনটারনেট ব্যবহার করলেও ক্রমাগত টেম্প ফাইল ও **Cookies** (কুকিস) জমা হয়। তার ওপর হার্ড ডিসকে লেখা অংশ টুকরো টুকরো হয়ে **Fragment** (ফ্র্যাগমেন্ট) হয়ে **Linked Chain** (লিংক্ড চেন) বা **Lost Chain** (লস্ট চেন) ও **Bad Sector** (ব্যাড সেক্টর) তৈরি করতে পারে। আর তো আছে কমপিউটার ভাইরাস এসে পড়া। নিয়মিত ব্যবহারে এমন সম্ভাবনা সব কমপিউটারেই থাকে।

এর থেকে উদ্ধারের উপায় কী? এমনটা হলে প্রতিবারই কী **C:** ড্রাইভ ফরম্যাট করে পুনরায় অপারেটিং সিসটেম, দরকারি প্রোগ্রাম, ও ডিভাইস ড্রাইভারগুলো ইনস্টল করতে হবে? এর ওপর তো আছে এক একটা **User Account** (ইউসার অ্যাকাউন্ট), **Password** (পাসওয়ার্ড), **Date-Time** (ডেট-টাইম), ইত্যাদি বহু কিছু আবার ঠিক করে দেওয়া বা সেট করা। ব্যাপারটা তাই আবার সেই প্রথম থেকেই শুরু করা, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। এই বিষয়টাতে আমরা পরে আসছি।

রক্ষণাবেক্ষণের প্রথম কাজ হল, হার্ড ডিসকে ক্রমাগত জমা হওয়া অদরকারি ফাইলগুলো মাঝেমধ্যেই মুছে ফেলা। এটা করে **Disk Clean Up** (ডিসক ক্লিন আপ)। এর জন্য আলাদা **Utiltiy Software** (ইউটিলিট সফ্টওয়্যার) পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার না করে উইনডোস সিসটেমেই যেটা আছে সেটাই ব্যবহার করা ভাল। উইনডোস-য়ে এটা পাওয়া যাবে—All Programs\Accessories\System Tools-য়ে। এর পরেই আছে **Defragmenter** (ডিফ্র্যাগমেন্টার)। ক্লিন-আপের পরে সেটা চালিয়ে নিতে হবে, বিশেষ করে **C:** ড্রাইভের জন্য। আরেকটা রাস্তা হল উইনডোস এক্সপ্লোরার (বা কমপিউটার আইকন) থেকে এক একটা ড্রাইভকে রাইট

ক্লিক করে ড্রাইভ প্রপার্টিটা খোলা। সেখান থেকেও ডিসক ক্লিন-আপ ও ডিফ্র্যাগমেন্ট চালানো যায়। নিয়মিত ডিসক ক্লিন-আপ ও ডিফ্র্যাগমেন্ট করলে **Hard Disk Crash** (হার্ড ডিসক ক্র্যাশ) হওয়ার সম্ভাবনা খানিকটা রোধ করা যায়। মনে রাখতে হবে হার্ড ডিসক ড্রাইভগুলোর অন্তত 30 শতাংশ জায়গা যেন খালি থাকে, বা **Unused Space** (আন্‌ইউসড স্পেস) থাকে।

সাধারণত ডিসক ক্লিন-আপ ও ডিফ্র্যাগমেন্ট করার পর কমপিউটারের কাজের গতি খানিকটা বাড়ে। কিন্তু তা সত্বেও যদি দেখা যায় যে কমপিউটার অত্যাধিক ঢিমে বা স্লো চলছে তাহলে বোঝা যাবে, অনেকগুলো **Memory Resident Program** (মেমরি রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম) লোড করা হয়েছে বা সিসটেম রেজিস্ট্রিতে গণ্ডগোল আছে। রেজিস্ট্রি ক্লিন করার জন্য আলাদা ইউটিলিটি সফ্‌টওয়্যার পাওয়া যায়। কিন্তু তার বদলে উইনডোস সিসটেমে রাখা **System Restore** (সিসটেম রেসটোর) ব্যবহার করাই ঠিক হবে। এটা পাওয়া যাবে উইনডোসের **Control Panel** (কনট্রোল প্যানেল)–**System and Security** (সিসটেম অ্যান্ড সিকিউরিটি) থেকে। সিসটেম রেসটোর করলে কমপিউটার সিসটেমটা আগেকার কোনও একটা দিনের অবস্থায় ফিরে যাবে। তাতে অবশ্য সাম্প্রতিককালে ইনস্টল করা প্রোগ্রামগুলো মুছে যাবে।

কমপিউটারের গতি ঠিক রাখার জন্য সাধারণ নিয়ম হল, এখন আর কাজ করা হয়না এমন প্রোগ্রামগুলো **Uninstall** (আন্‌ইনস্টল) করে ফেলা। এর উপায় কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আন্‌ইনস্টল প্রোগ্রাম ব্যবহার করা। ডেসকটপে যে প্রোগ্রাম আইকনটা দেখায়, সেটা ডিলিট করলেও প্রোগ্রামটা কিন্তু থেকেই যায়। কমপিউটারের গতি স্লো হওয়ার কারণ খোঁজা যায় **Task Manager** (টাস্ক ম্যানেজার) দিয়ে। এটা পাওয়া যাবে টাসক বারে রাইট ক্লিক করে — কমপিউটারের মেমরিতে কটা **Processes** (প্রসেস) লোড হয়ে আছে, কত মেমরি নিয়েছে, কত খালি আছে সেই হিসাব থেকে। এমন প্রোগ্রাম যা অত্যাধিক মেমরি নেয়, তা ব্যবহার না করাই উচিত, নয়ত র‍্যাম বাড়ানো দরকার।

System Repair Disk (সিসটেম রিপেয়ার ডিসক)

ডিসক ক্লিন-আপ ও ডিফ্র্যাগমেন্ট করা সত্বেও হার্ড ডিসক ক্র্যাশ করতে পারে। সেটা হলে কমপিউটার **C:** ড্রাইভ থেকে সিসটেম সফ্‌টওয়্যারটা পড়তেই পারে না, ও তাই চালুই হয় না। সিসটেম রেজিস্ট্রি ফাইলটা নষ্ট বা **Corrupt** (কোরাপ্ট) হয়ে গেলেও তাই হবে। এমনটা হলে প্রয়োজন হবে **System Repair Disk** (সিসটেম রিপেয়ার ডিসক)। উইনডোস সিসটেম ইনস্টল করার পরে এটা অতি অবশ্যই তৈরি করে রাখা

উচিত। এটা হল একটা **Boot Disk** (বুট ডিসক) বা সিডি/ডিভিডি যেখানে কমপিউটার চালু করা ও উইনডোস সিসটেমের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো কপি করা থাকে। এটা যে কোনও সময়ই তৈরি করে নেওয়া যায়, একটা নতুন বা খালি সিডি/ডিভিড দিয়ে, কনট্রোল প্যানেলের **System Security** (সিসটেম সিকিউরিটি) থেকে।

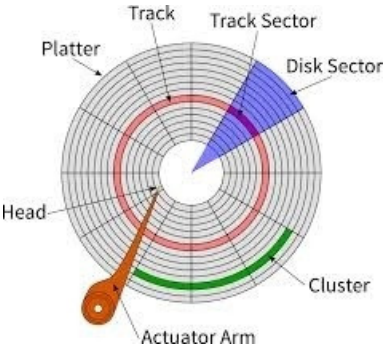

বুট ডিসক ব্যাপারটা একটু জেনে রাখা ভাল। যেকোনও স্টোরেজ ডিসকের (হার্ড ডিসক, সিডি/ডিভিডি, পেন ড্রাইভ বা মেমরি কার্ড) যতটা জায়গা আছে, তাকে **Format** (ফরম্যাট) করে **Track** (ট্র্যাক) ও **Sector** (সেক্টর) হিসাবে ভাগ করা হয়। প্রথম ট্র্যাকটাকে নম্বর দিয়ে বলা হয় ট্র্যাক জিরো। এই **Track 0** (ট্র্যাক জিরো)-তে থাকে ডিসকটার পার্টিশন ও ফাইল অ্যালোকেশনের তথ্য — কী কী ফাইল রাখা আছে ও কোন্ ট্র্যাক ও সেক্টরে। এটাকে বলা হয় **File Allocation Table** (ফাইল অ্যালোকেশন টেবল), বা **FAT** (ফ্যাট) যা অনেকটা যেন বইয়ের প্রথমেই রাখা সূচিপত্রের মতো। বুট ডিসকের এই ট্র্যাক জিরোতে থাকে অপারেটিং সিসটেম সফ্‌টওয়্যারের মূল **Executable File** (এক্সিকিউটেবল ফাইল), যা দিয়ে সিসটেমটা চালু হয়। উইনডোস সিসটেমে এই ফাইলটার নাম **command.com** (কমান্ড ডট কম)।

যে কোনও ডিসক বা পেন ড্রাইভকেও **System Format** (সিসটেম ফরম্যাট) করে **Bootable** (বুটেব্‌ল) করে নেওয়া যায় (পেন ড্রাইভকে সিসটেম ফরম্যাট করতে আলাদা প্রোগ্রাম লাগে, অপারেটিং সিসটেমে সে ব্যবস্থা না থাকলে) । শুধুমাত্র বুটেব্‌ল ডিসক দিয়ে বুট করলে কমপিউটার চালু হবে শুধুই **Command Prompt** (কমান্ড প্রম্পট) বা **C:** স্ক্রিনে দেখিয়ে। আর কিছু করা যাবে না, যদিনা ডিসকে আরও কিছু কাজের নির্দেশ ফাইল হিসাবে কপি করা থাকে। উইনডোস সিসটেমের কনট্রোল প্যানেল থেকে সিসটেম রিপেয়ার ডিসক বানালে ও সেই ডিসক দিয়ে বুট করলে তুমি উইনডোসের যে **Version** (ভারশন) ব্যবহার করেছ, সেটারই কিছু ন্যূনতম

প্রয়োজনীয় ফাইলও ডিসকে কপি হবে। ফলে এটা দিয়ে বুট করলে ওই ভারশনের উনডোসেরই একটা ছোট সংস্করণ চালু হবে ওই ডিসক থেকেই।

এটা দিয়েই হার্ড ডিসকের ড্রাইভগুলো **Scan** (স্ক্যান) করা যাবে ও রিপেয়ারও করা যাবে। অথবা, All Programs\Accessories\ থেকে **Command Prompt** (কমান্ড প্রম্পট) নিয়ে হার্ড ডিসক ড্রাইভগুলো ঠিক করা যাবে **chkdsk/r** কমান্ড দিয়ে। এরপর সিসটেম রেসটোর ব্যবহার করে নিতে হবে ও কমপিউটার বন্ধ করে আবার চালু করে দেখতে হবে **C:** ড্রাইভ থেকেই আগের মতো চলছে কিনা। যদি এতেও না ঠিক হয়, তাহলে **C:** ড্রাইভকে ফরম্যাট করা ছাড়া উপায় থাকবে না। ফরম্যাটও করা না গেলে বুঝতে হবে হার্ড ডিসকটা ঠিক করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে অন্য পার্টিশনে তোমার কাজের ডেটাগুলো পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা। এই চেষ্টা এক বিশেষ পদ্ধতিতে করে দেখা যেতে পারে। অন্য কমপিউটারের এই হার্ড ডিসকটা দ্বিতীয় ডিসক হিসাবে লাগিয়ে দেখা যেতে পারে, যাকে বলে, **Slave Mode** (স্লেভ মোড) ।

সিসটেম রিপেয়ার ডিসক দিয়ে বুট করার পদ্ধতিটা আরও একটু জানতে হবে। কমপিউটার চালু করলে প্রথমেই স্ক্রিনে দেখায় মাদারবোর্ড ও প্রসেসরটা চালু হয়েছে। এই স্ক্রিনটা কয়েক সেকেন্ড থাকার পরেই চলে যায় ও অপারেটিং সিসটেমটা **C:** ড্রাইভ থেকে বুট হতে শুরু করে। তাহলে আমরা সিসটেম রিপেয়ার ডিসক দিয়ে বুট করব কী করে? এই প্রথম বুট স্ক্রিনটা একটু লক্ষ করে দেখো। এখানে লেখা থাকে **Boot Device** (বুট ডিভাইস) F10 (বা কোনও কোনও প্রসেসর-য়ে F12) । এছাড়া দেওয়া থাকে বুট স্ক্রিনে থাকাকালীন কোন কোন বাটন টিপলে **BIOS** (বায়োস) পাবে, ডিফল্ট লোড করা যাবে ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন প্রসেসর-য়ে বিভিন্ন হতে পারে। তাই বুট স্ক্রিনটা লক্ষ করে রাখতে হয়। বুট ডিভাইস F10 (বা F12) বাটনটা টিপলেই ডিভাইসগুলো দেখাবে—হার্ড ডিসক, রিমুভেবল সিডি/ডিভিডি, পেন ড্রাইভ। এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিডি/ডিভিডি । কিন্তু কমপিউটারে আগে থেকেই বুট ডিসকটা ভরে রাখতে হবে। এখানে বুটেব্‌ল ডিসক না পেলে BIOS-য়ে বলে দেওয়া **Boot Sequence** (বুট সিকুয়েন্স) অনুসারে **C:** ড্রাইভ থেকেই বুট করবে। তাই বুট ডিভাইস নিতে হলে বুট ডিসকটাকে আগে থেকে ভরে রাখতে হয়।

System Imaging (সিসটেম ইমেজিং), **System Recovery** (সিসটেম রিকভারি)
আমরা দেখেছি যে এমন হতেই পারে যখন **C:** ড্রাইভকে ফরম্যাট করা ছাড়া উপায় থাকে না, আর তখনই ওখানে যা কিছু রাখা ছিল সব মুছে যায়। তাহলে কী **C:**

ড্রাইভকে ফরম্যাট করা হলে প্রতিবারই সেই প্রথম থেকেই অপারেটিং সিসটেম, দরকারি প্রোগ্রামগুলো, ও ডিভাইস ড্রাইভারগুলো, ও আর যা কিছু সেট করে নেওয়া হয়েছিল তার সবকিছুই, আবার ইনস্টল করতে হবে, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ? এর সমাধান হল সিসটেম ইমেজিং ও রিকভারি।

C: ড্রাইভ (বা যেকোনও ড্রাইভ)-য়ের একটা ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি তৈরি করে একটা ফাইল হিসাবে অন্য কোথাও (অন্য কোনও হার্ড ডিসক ড্রাইভ, ডিভিডি, বা পেন ড্রাইভে) রেখে দেওয়াকে বলে **Creating Image** (ক্রিয়েটিং ইমেজ)। এই ফাইলটা অবশ্য বেশ বড় সাইজের হবে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন মতো এই ফাইলটাকে ব্যবহার করে সেই ড্রাইভেই ইমেজটা প্রতিস্থাপন করাকে বলে **Image Recovery** (ইমেজ রিকভারি)। এর সুবিধা অনেক। চট করে **C:** ড্রাইভকে হুবহু আগের মতো করে নেওয়া যায়। ফরম্যাট করার দরকারও পড়ে না। তাই কমপিউটার স্লো হয়ে গেলে, সিসটেম সফ্টওয়্যার ঘেঁটে গেলে, বা ভাইরাস ইত্যাদি ঢুকে গেলে, আমরা সহজেই উদ্ধার পেতে পারি।

উইনডোস সিসটেমেই এর ব্যবস্থা রাখা আছে—Control Panel–System Security–BackUp and Restore–Create a System Image। এটা চালিয়ে যে ড্রাইভটা বলে দেওয়া হবে সেখানে WindowsImageBackup (উইনডোসইমেজ ব্যাকআপ) নামে একটা ফাইল তৈরি হবে । System Repair Disk (সিসটেম রিপেয়ার ডিসক) দিয়ে বুট করে ঢুকে এই ফাইলটা থেকেই পরবর্তীকালে রিকভার করা যাবে । **Advanced Recovery** (অ্যাডভান্সড রিকভারি) হিসাবে ইমেজ রিকভারি পাওয়া যাবে কনট্রোল প্যানেলের Security–BackUp and Restore ।

এই কাজটা করে দেওয়ার আলাদা ইউটিলিটি সফ্টওয়্যারও পাওয়া যায়, যেমন **Acronis True Image** (অ্যাক্রনিস ট্রু ইমেজ)। এই সফ্টওয়্যারটাকে একটা বুট ডিসকে রাখতে হয়, ও সেটা দিয়ে বুট করে কমপিউটার চালিয়ে, এর সাহায্যে ড্রাইভের ইমেজ তৈরি করে রাখতে হয় অন্য কোনও ড্রাইভে একটা ফাইল নাম দিয়ে (তারিখ উল্লেখ করা ভাল)। মনে রাখতে হবে, এটা হবে প্রাইমারি অ্যাকটিভ ড্রাইভ। পরে আবার ওই বুট ডিসক দিয়ে বুট করে ঢুকে এই ফাইলটা থেকেই রিকভার করতে হবে প্রাইমারি অ্যাকটিভ ড্রাইভ হিসাবে **C:** ড্রাইভকে । সমস্যা হল, অনেক সময় ড্রাইভ লেটারগুলো একটু অন্য দেখাতে পারে। তাছাড়া ভুল করে কেউ রিকভারি ইমেজ ফাইলটা ডিলিট করে ফেলতে পারে। উইনডোস দিয়ে ইমেজিং করলে সে

সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ইমেজ ফাইলটা **Administrator** (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর)-য়ের অনুমতি বা **Permission** (পারমিশন) ছাড়া ডিলিট করা যায় না।

কমপিউটারের ইনস্টল করা যাবতীয় সফ্টওয়্যারগুলো নিয়ে যে সিসটেমটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার রক্ষণাবেক্ষণে অবশ্যপ্রয়োজনীয় হল সিসটেম ইমেজ তৈরি করে রেখে দেওয়া। প্রথমেই অপারেটিং সিসটেম ও ডিভাইস ড্রাইভারগুলো ইনস্টল করার পর ঠিক করে নিতে হয় অবশ্যপ্রয়োজনীয় আর কী কী প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হবে ও সেগুলো ইনস্টল করে নিতে হয়। এরপর ইউসার অ্যাকাউন্ট, অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট ও তার পাসওয়ার্ড, ইনটারনেট কানেকশনগুলোর পাসওয়ার্ড, ডেসকটপ ব্যাকগ্রাউন্ড, স্ক্রিন-সেভার, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো ঠিক করে দেওয়ার পর তখনই তার একটা সিসটেম ইমেজ তৈরি করে রাখা উচিত। পরবর্তীকালে অন্য কোনও প্রোগ্রাম অবশ্যপ্রয়োজনীয় হিসাবে রাখতে হলে আগে একবার সিসটেম রিকভার করে নিয়ে এইখানেই ফিরে এসে নতুন প্রোগ্রামটা ইনস্টল করতে হবে ও সিসটেম ইমেজটা আপডেট বা আবার করে নিতে হবে। কমপিউটারের সফ্টওয়্যারগুলো রক্ষণাবেক্ষণের এটাই শেষ কথা।

User Account (ইউসার অ্যাকাউন্ট) ও
Administrator Account (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট)

যে কোনও কমপিউটারেই, একেবারে নিজস্ব ব্যবহারে থাকলেও, যাকে বলে **Stand Alone** (স্ট্যান্ড অ্যালোন), **Administrator Account** (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট) ও **User Account** (ইউসার অ্যাকাউন্ট) তৈরি করা ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট-য়ের জন্য একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে নেওয়া উচিত। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট দিয়েই সিসটেম রিকভারি ইমেজ করে রাখা প্রয়োজন। উইনডোস সিসটেমে ইউসার অ্যাকাউন্ট ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট তৈরি করার ব্যবস্থা রাখা আছে—Control Panel–User Accounts–Add or remove user accounts।

একাধিক কমপিউটার নিয়ে **Local Area Network** (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) বা **LAN** (ল্যান) হলে **Server** (সার্ভার) কমপিউটারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট করতেই হয়। কিন্তু সেইসঙ্গে **Terminal** (টার্মিনাল) কমপিউটারগুলোতেও সেগুলোর জন্য নিজস্ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট ও ইউসার অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ইমেজ করে রাখা ভাল। কোনও কারণে সিসটেম বসে গেলে ইমেজ রিকভারি করে সহজেই সিসটেমটা আবার চালু করা যায়।

সাধারণভাবে কাজ করার সময় ইউসার অ্যাকাউন্ট দিয়ে **Log in** (লগ্ ইন) করে কাজ করতে হবে। কিন্তু অন্য কোনও সফ্টওয়্যার ইনস্টল করতে বা সিসটেমে যে কোনও রকম পরিবর্তন করতে গেলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-য়ের পারমিশন লাগবে, বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট থেকে **Log in** করে তা করতে হবে।

সর্বদা ইউসার অ্যাকাউন্ট লগ্ ইন করে কাজ করলে শুধু যে ভুল করে কোনও সিসটেম বা প্রোগ্রাম ফাইল ডিলিট করে ফেলা আটকাবে তাই নয়। এর বাড়তি একটা দিক হল কমপিউটার সিসটেমে ভাইরাস বা ম্যল্ওয়্যার ঢোকাও আটকাবে। ভাইরাস বা ম্যল্ওয়্যারগুলো ছোট একটা **Auto Executable Program** (অটো এক্সিকিউটেব্ল প্রোগ্রাম) ফাইল হিসাবে কমপিউটার সিসটেমের কোথাও না কোথাও কপি হয়ে ঢুকে থাকে ও থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেস হিসাবে চালু হয়ে যায় (আজকাল অবশ্য ইন্টারনেটে নন্-ফাইল মেমরি ভাইরাসও দেখা যাচ্ছে)। এটা কখনই সম্ভব হয়না, যদি সর্বদা ইউসার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয় ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড প্রটেক্ট করে রাখা হয়ে। অবশ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যদি না জেনে যদি কোনও প্রোগ্রাম ইনস্টল করে যাতে ভাইরাস আছে তাহলে আলাদা কথা।

অন্যান্য বিষয়

Virus Protection (ভাইরাস প্রোটেক্শন)

কমপিউটারে কখনো না কখনো ভাইরাস আসবেই। আসবে, হয় অন্যের কোনও পেন ড্রাইভ (গান, সিনেমা, ছবি, ইত্যাদি কপি করতে) লাগানোর ফলে, অথবা ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় না-জানা ওয়েবসাইটে ঢোকার ফলে, যেটাতে ভাইরাস আছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় না, এমন কমপিউটারে **Antivirus** (অ্যান্টিভাইরাস) প্রোগ্রাম ইনস্টল করে তেমন লাভ হয়না, কারণ এই প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত আপডেট করতে হয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে, যাতে নিত্যনতুন ভাইরাস যা তৈরি ক্রমাগত করা হয় তাকেও আটকানো যায়। তাছাড়া আপডেট না করলে এগুলো ঠিক কাজও করে না। তাই, ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় না এমন কমপিউটারে অতি অবশ্যই ইউসার অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড দেওয়া অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট, আর সেইসঙ্গে সিসটেম ইমেজ রিকভারির ব্যবস্থা রাখা একান্ত দরকার।

ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয় এমন কমপিউটারে শুধু ভাইরাস প্রোটেক্শন নয়, **Internet Security** (ইন্টারনেট সিকিউরিটি) সফ্টওয়্যার ইনস্টল করে নেওয়া উচিত, বিশেষত **Netbanking** (নেট-ব্যাংকিং) বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জিনিসপত্র কেনাকাটা করলে। কিন্তু এই সফ্টওয়্যারগুলো ইনস্টল করে চালাতে 2GB

RAM (র‍্যাম) কম করে লাগবেই । তা সত্বেও অবশ্য কমপিউটারের চলার গতি বা স্পীড বেশ খানিকটা কমে যাবে। মনে রাখতে হবে, অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম একটার বেশি ইনস্টল করা চলবে না— কমপিউটার হ্যাঙ করে যেতে পারে। আগের অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামটার বদলে অন্য একটা ইনস্টল করতে হলে আগেরটাকে প্রথমে আন্‌ইনস্টল করে নিতে হবে।

Operating System (অপারেটিং সিসটেম) ও কী ধরনের কমপিউটার

বাজারে (উইনডোস) সিসটেমটাই বেশি প্রচলিত বলেই হয়ত আমরা অনেকে সেটাই ব্যবহার করি, যদিও তুলনামূলক বিচারে **Linux** (লিনাক্স) অপারেটিং সিসটেম ব্যবহারে বেশ কয়েকটা সুবিধার দিক আছে। এটা পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, যাকে বলে **Freeware** (ফ্রিওয়্যার), আর ক্রমাগত নতুন নতুন ভারশনের পেছনে ছুটতে হয় না। এতে ভাইরাস সমস্যা তেমন নেই বললেই চলে, ইন্টারনেট সিকিউরিটির সমস্যা ছাড়া।

মাইক্রসফ্‌ট কোম্পানির অপারেটিং সিসটেমের বাজার বিশ্বজোড়া। এরা পার্‌সনাল কমপিউটারের প্রথম পর্যায়ে ডিসক অপারেটিং সিসটেম বাজারে আনে। তারপর একেই উন্নত করে উইনডোস সিসটেমে। তারপর থেকে তারা একের পর এক ভারশন বাজারে এনে চলেছে। নিচের তালিকা থেকে এটা বোঝা যাবে।

> MS-DOS – Microsoft Disk Operating System (1981),
> Windows 1.0 (1985), Windows 2.0 (1987), Windows 3.x (1990,
> 1992), Windows 95 (1995) Windows 98 (1998),
> Windows ME (2000),Windows XP (2001), Windows Vista (2006),
> Windows 7 (2009), Windows 8 (2012), Windows 8.1 (2013),
> Windows 10 (2015)

এতগুলোর উইনডোস ভারশনের মধ্যে কেবল আনডারলাইন করাগুলোই বাজারে কিছুটা স্থায়ী হতে পেরেছে। Vista ও Windows 8 ভারশন দুটোর অভিজ্ঞতা বেশ খারাপ। Windows 10-য়ের লক্ষ্য মূলত চটজলদি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা করা। অন্যান্য কাজের জন্য এখনও Windows 7 বরং ভাল। তাই ব্যবহারকারির সংখ্যার হিসাবে 2018 সাল পর্যন্ত Windows 7 হল 36.9 শতাংশ, আর Windows 10 হল 39.22 শতাংশ। সুতরাং, কোম্পানি যখনই বাজারে নতুন জিনিস আনে তখনই তার পিছে ছুটে যাওয়া কাজের কথা নয়, কারণ তা যে আরও ভাল এমন নিশ্চয়তা নেই।

আজকাল বাজারে এসেছে আগেকার 32 bit অপারেটিং সিসটেমের জায়গায় 64 bit অপারেটিং সিসটেম ও আপাতত দুটোই চলছে। 32 bit বা 64 bit আসলে বোঝায় প্রসেসর কতটা করে তথ্যের অংশ এক একবারে তুলবে ও ব্যবহার করবে, আর

রেজিস্ট্রি কত বড় হবে। আগেকার প্রসেসর ছিল 32 bit যেগুলোকে চিহ্নিত করা হত, 8086, 80286, 80386, 80486, 80586 করে। শেষের 586-য়ের আবার Dual Core (ডুয়াল কোর) ও Core 2 Duo (কোর টু ডুয়ো) বাজারে এসেছিল। এগুলোতে যে অপারেটিং সিসটেম ব্যবহার হত, তা ছিল 32 bit ও সেটা বোঝানো হত x86 লিখে। এখন বাজারে এসেছে **Intel Core** (ইনটেল কোর) i3, i5, ও i7 আর **AMD**-র A6, A8, A10, A12 সিরিজের প্রসেসর, যেগুলো 64 bit আর গঠন অনেকটাই অন্য। তাই মাদারবোর্ডের গঠনও পাল্টে গেছে। এই সিরিজের প্রসেসরের জন্য এসেছে 64 bit অপারেটিং সিসটেম আর তার ন্যূনতম র‍্যাম প্রয়োজন হয়ে গেছে 4GB। সুতরাং, প্রসেসর 64 bit না হলে ও সেই সঙ্গে র‍্যাম 4GB না থাকলে 64 bit অপারেটিং সিসটেম ব্যবহার করে কোনও লাভ নেই। উল্টে কমপিউটারের গতি খানিকটা কমেই যেতে পারে। তাই আগেকার 32 bit প্রসেসর হলে 32 bit অপারেটিং সিসটেমই ব্যবহার করা ভাল।

Program Update (প্রোগ্রাম আপডেট)

আজকাল সব প্রোগ্রাম বা সফট্ওয়্যার, যা বাজারে বিক্রি করা হয়, মানে যা **Freeware** (ফ্রিওয়্যার) নয়, সেগুলোর প্রত্যেকটা কপির সাথে দেওয়া হয় এক একটা নির্দিষ্ট **Licence Key** (লাইসেন্স কীই) বা **Product Key** (প্রোডাক্ট কীই) হিসাবে লম্বা একটা নম্বর। প্রোগ্রামটার ওই কপিটা ইনস্টল করার সময় এটা লাগে।

ইনস্টল করার শেষে একটা নিয়মমাফিক মেসেজ আসবে যে ইন্টারনেট দিয়ে এই কপিটার আইনমাফিক ব্যবহারকারি হিসাবে রেজিস্টার করো সফট্ওয়্যার কোম্পানিটার কাছে। এটা করলেই কোম্পানি করবে কী—এই কমপিউটারটার মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট নম্বরটা ও তোমার সম্বন্ধে তথ্যগুলো তোমার কমপিউটারে ঢুকে জেনে নেবে। এও হল একধরনের **Hacking** (হ্যাকিং)। হ্যাকিং-য়ের মানে হল তোমার অজান্তে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার কমপিউটারে ঢুকে তথ্যগুলো নিয়ে নেওয়া ও চাইকি উল্টোপাল্টা করে দেওয়া। হ্যাকাররা তোমার কমপিউটারে রাখা যাবতীয় সিকিউরিটি, পাসওয়ার্ড, **Encryption** (এন্ক্রিপশন) ইত্যাদির বাধা টপকে ঢুকে পড়ে।

প্রোডাক্ট কীই দিয়ে রেজিস্টার করা সফট্ওয়্যারটা যদি অন্য কোনও কমপিউটারেও একই প্রোডাক্ট কীই ব্যবহার করে ইনস্টল করা হয়, তাহলে সেটাকে বলা হবে **Pirated** (পাইরেটেড) কপি। এটাকে ইন্টারনেট দিয়ে রেজিস্টার করতে গেলেই বেআইনি ব্যবহারকারি বলে সফট্ওয়্যার কোম্পানি কমপিউটারটাকেই ব্ল্যাক-আউট করে

দেবে (এ হল আইনমাফিক হ্যাকিং) বা বন্ধ করে দেবে, ও তেমন হলে তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে।

অনেক কোম্পানি তাদের প্রোগ্রামগুলো, বিশেষত উইনডোস অপারেটিং সিসটেম, ইনস্টল করার পর ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনা আপনি আপডেট হওয়ার ব্যবস্থা করে রাখে। অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত আপডেট করার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু যেসব প্রোগ্রাম বেশ কিছুকাল ধরেই বাজারে স্থায়ী হয়েছে, সেগুলো আপডেট করার প্রয়োজন হয়না, এমনকি কোম্পানিই প্রোগ্রামটার আর কোনও পরিবর্তনও করে না। আপডেট করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে কেবল সেইসব প্রোগ্রাম, যা কোম্পানি চটজলদি বাজারে ছেড়ে দিয়েছে ও পরে তার কিছু কিছু গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। এই গণ্ডগোলগুলো কোম্পানি ঠিক করে **Service Pack** (সার্ভিস প্যাক) বা **Patch** (প্যাচ) তৈরি করে দিয়ে, ও রেজিস্টার করা ব্যবহারকারিরা প্রোগ্রামটা আপডেট করে সেটা পেয়ে যায়।

কিন্তু যারা পাইরেটেড বা পাসওয়ার্ড **Crack** (ক্র্যাক) করা প্রোগ্রাম ইনস্টল করেছে, তাদের সেই প্রোগ্রামটা ইন্টারনেটে আপডেট হতে গেলেই সেই একই বিপদ—কোম্পানির কাছে ধরা পড়ে যায় যে এটা পাইরেটেড কপি। এই কারণে এরা করে কী—আপনা আপনি প্রোগ্রাম আপডেট হওয়াটাকে বন্ধ করে রাখে। এটা তারা করে Control Panel\System Security\AdministrativeTools\Services খুলে প্রোগ্রাম আপডেটগুলো সাবধানে খুঁজে নিয়ে **Start up Status** (স্টার্ট আপ স্টেটাস)-কে **Automatic** (অটোম্যাটিক) না রেখে **Manual** (ম্যানুয়াল) করে দিয়ে।

কয়েকটা সিসটেম কমান্ডের উদাহরণ

স্টার্ট মেনু আইকনটাতে ক্লিক করলে যে লিস্টটা খোলে তার একদম নিচে আছে **Search Programs or Files** (সার্চ প্রোগ্রামস অর ফাইলস)। এখানে **command.com** বা **cmd** টাইপ করে এন্টার করলে আসে **DOS** কমান্ড প্রম্পট, %temp% এন্টার করলে আসে যাবতীয় temp বা টেম্পরারি ফাইলস, regedit এন্টার করলে আসে **System Registry** (সিসটেম রেজিস্ট্রি), **credential** (ক্রেডেন্‌শিয়াল) এন্টার করলে আসে পাসওয়ার্ডগুলো, ইত্যাদি। আরও না শিখে এগুলো আপাতত ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। শুধু জানার জন্য করে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শব্দনির্দেশ

32-bit, 129
64-bit, 129
Access, 60, 85, 112, 125
Accessories, 46, 56, 134, 137
Accessory, 110
Add to Dictionary, 77, 86
Addition, 88, 96, 107
Address Bar, 25, 42
Administrator Account, 139
ADSL, 113
Align Center, 80, 86
Align Left, 86
Align Text, 59, 80, 86
Alignment, 102, 107
All Programs, 45, 46, 56, 60, 85, 134, 137
Alt Key, 40, 43
Alt+F, 17, 18, 22, 64, 76, 86
Alt+F4, 17, 18, 22, 64
Antivirus, 111, 140
Apps, 111
Archive, 38, 42
ASCII, 122
Assembled, 127, 133
Assembled Parts, 127
Attachment, 116, 129
Attribute, 38, 42
Audio CD, 25, 42
Auto Executable Program, 140
Auto Sum Function, 98, 107
Backslash, 28, 42
Backspace, 41, 43, 71
Back-up, 130
Bad Sector, 134
Band-Width, 112
Binary System, 121, 122
BIOS, 124, 125, 126, 137
Bit, 123
bit per second, 123
Blank Document, 63, 85
Blinking Cursor, 68, 69, 86
Bold, 78, 86
Boot, 8, 21, 132, 136, 137
Boot CD, 132
Boot Device, 137
Boot Disk, 136
Border, 59, 80, 87
Branded, 133
Broadband, 112
Browse, 67, 86
Browser Cache, 120
Brushes Menu, 54, 55, 57
Bullets, 59, 81, 82, 87
Byte, 123
byte per second, 123
Cabinet, 7, 21, 126, 127
Cancel, 49, 57
Capital Letter, 40, 42
Caps Lock, 40, 42
CD/DVD, 8, 21, 132
Cell, 91, 99, 102, 107
Cell Formula Copy Paste, 99, 107
Cell Number, 91, 107
Cell Orientation, 102, 107
Central Processing Unit, 7, 21
Centre Tab, 66, 85
Change Case, 79, 86
Character, 6, 21, 58, 79, 86

Character Spacing, 58, 79, 86
Chart, 106, 108
Chassis, 126, 127
Check Box, 38, 42, 76
Checksum Error, 131
chkdsk/r, 137
Circular Reference, 102, 107
Clipboard, 54, 57, 74, 75
Close, 13, 22, 48, 49, 56
CMOS, 125, 126, 127, 131
Codification System, 121
Colors, 54, 57
Column Width, 88, 104, 107
Columns to repeat, 105, 108
Command Prompt, 136, 137
command.com, 136, 143
Communication, 109
Computer Language, 110
Computer Program, 110
Control Panel, 135, 138, 139, 143
Cookies, 134
Copy, 34, 42, 58, 74, 75, 88, 90, 94, 107
Copy-Paste, 88, 94, 107
CPU, 7, 21, 126
Crack, 143
Create, 36, 42, 63, 85, 138
Create shortcut, 36, 42
Crop, 55, 57
Ctrl+Alt+Del, 18, 22
Ctrl+G, 66, 86
Ctrl+S, 63, 72, 85
Ctrl+V, 75, 86
Ctrl+X, 75, 86
Cursor, 9, 18, 21, 22, 41, 43, 47, 56, 70, 72
Cursor Key, 18, 22, 41, 43, 72
Cursor Position, 47, 56
Cut, 34, 42, 58, 74, 75
Data and Formula Input Bar, 91, 107
Data Entry, 88, 92, 107
Data type, 104, 107
Database Application File, 63, 85
Database Management, 62, 85
ddr, 129
Decimal Places, 105, 107
Decimal System, 122
Decimal Tab, 66, 86
Decode, 121
Default File Location, 49, 57
Default File Type, 50, 57
Default program, 52, 57
Default Tab Stops, 82, 87
Defragment, 134
Defragmenter, 134
Delete, 32, 41, 42, 43, 58, 71, 73, 86, 88, 90, 95, 107
Delete Data, 88, 95, 107
Delete Key, 41, 43, 71
Delete Text, 58, 71, 73, 86
Design, 64, 85
Desktop background, 9, 21
Desktop Computer, 6, 21
Device Driver, 130, 133
Dialog Box, 63, 66, 85
Dialogue Box, 49, 56, 76, 78, 79, 84
Digit, 122
Digital, 7, 21, 33, 109, 113, 121
Digital Subscriber Line, 113
DIN Connector, 130

Disk Clean Up, 134
Display, 6, 21, 54, 57, 124, 126
Display Device, 126
Display Monitor, 6, 21, 124
Division, 88, 100, 107
DNS, 116, 118, 119, 120
Document Area, 61, 65, 85
Document File, 61, 85
Domain Name, 116, 118, 119, 121
DOS, 141, 143
dot File, 84, 87
Double click, 10, 21
Download, 113
Drag, 14, 22, 72
Drive, 7, 21, 126, 127, 132
Edit Color, 55, 57
Editing Text, 58, 73, 86
Eject, 131
Electronic, 116, 117, 121
Email, 111, 116
Email ID, 116
Email Service Provider, 116
Empty, 32, 42
Encode, 121
Encryption, 142
End, 41, 43, 70, 92
Enter Key, 18, 22, 40, 43
Error Message, 51, 57, 102
Esc, 40, 42, 49, 56, 72, 95, 99
Ethernet Port, 113
Excel, 60, 85, 89
Executable File, 136
Exit, 48, 56, 63
Field, 84, 87
File, 25, 33, 34, 42, 50, 111, 117, 130, 136
File Allocation Table, 136
File Format, 33, 42
File icon, 34, 42
Filename, 25, 33, 42, 47, 56, 61, 62, 63, 85
Filename Extension, 33, 42, 61, 62, 63, 85
Fill, 55, 57
Find, 58, 66, 75, 76, 86
First Line Indent, 65, 81, 85
Folder, 26, 27, 42, 49, 63, 85
Folder Location, 63, 85
Folder name, 26, 42
Folder tree, 27, 42
Font, 58, 77, 78, 79, 86, 102, 107
Font Color, 58, 79, 86
Font Effect, 58, 79, 86
Font Size, 58, 78, 86
Font Style, 58, 78, 86
Footer, 64, 84, 85
Format, 64, 85, 88, 104, 107, 130, 134, 136
Format Cells, 88, 104, 107
Formatting Text, 58, 73, 77, 86
Forms, 62, 85
Formula Setting, 88, 101, 107
Fragment, 134
Freeware, 141, 142
Front Panel, 126, 127, 129
ftp, 117
Full screen, 56, 57
Function, 40, 43, 93, 106, 108
Function Key, 40, 43, 93
Go to, 66, 86

Grammar Check, 58, 77, 86
Ground Line, 131
Hacking, 111, 142
Hang, 17, 22
Hanging Indent, 65, 81, 85
Hard Disk, 7, 21, 25, 42, 126, 135
Hard Disk Crash, 135
Hard Disk Drive, 7, 21, 126
Hard Disk Partition, 25, 42
Hardware, 8, 21, 110, 123, 131
HDD, 126, 127, 129
HDMI, 130
Header, 64, 84, 85
Help, 67, 86
Hertz, 123
Hexadecimal, 122
Hidden, 38, 42
Highlight, 10, 21, 71
Home, 41, 43, 47, 53, 56, 57, 70, 77, 92, 93, 102, 104
Home Tab, 47, 53, 56, 57
Horizontal Scroll Bar, 15, 22
Hotspot, 114
http, 116, 117, 121
hyper text, 116
ICANN, 118, 121
Icon, 9, 21, 75
Image, 54, 111, 138
Inbox, 116
Indent, 59, 81, 82, 87
Information, 109, 122
Information and Communication Technology, 109
Information Technology, 109
Input, 7, 21, 110, 124
Input Device, 7, 21, 124
Input Output Device, 110
Insert, 41, 43, 58, 64, 69, 70, 74, 84, 85, 86, 88, 90, 93, 107
Insert Page Number, 69, 86
Insert Sheet Columns, 94, 107
Insert Sheet Rows, 88, 93, 107
Insert Text, 58, 74, 86
Insertion Point, 58, 67, 68, 86
Install, 20, 22, 133
Internet, 111, 112, 114, 115, 118, 140
Internet Security, 140
Internet Service Provider, 112
IP Address, 114, 116, 118, 119, 120
Italics, 78, 86
Jumper, 127
Justify, 80, 86
Keyboard, 6, 21, 124, 127
Label, 102, 107
Landscape, 83, 87
Language, 66, 77, 86
Laptop Computer, 6, 21
Layout, 64, 85
Leechers, 117
Left click, 10, 21
Left Indent, 65, 85
Left Tab, 66, 85
Licence Key, 142
Line Spacing, 59, 80, 86
Linked Chain, 134
Linked Program, 52, 57
Linux, 8, 21, 110, 141
List, 11, 21, 40, 43
List item, 11, 21
List Key, 40, 43

Load, 25, 42, 133
Local Area Network, 139
Logical Operator, 124
Login ID, 114
Lost Chain, 134
Mail Merge, 84, 87
Mailing, 84, 87
Malware, 111, 117
Manual, 143
Margin, 59, 72, 83, 87, 105, 107
Match case, 76, 86
Maximise, 13, 21
Measurement Units, 65, 85, 123
Memory, 36, 42, 75, 109, 125, 135
Memory Card, 109
Memory Resident Program, 135
Menu Bar, 25, 42, 47, 56, 64
Menu List, 47, 56, 64
Menu Tab, 53, 57, 64
Merge, 103, 107
Message, 17, 18, 22, 32
Microsoft Office, 53, 57, 60, 85
Microsoft Windows, 8, 21, 110
Minimise, 13, 21, 47, 56
Minimise Ribbon, 47, 56
Modem, 113
More options, 37, 42
Motherboard, 124, 126, 127
Mouse, 6, 15, 21, 22, 70, 72, 124, 127
Mouse Scroll Button, 15, 22
Move, 35, 42, 58, 69, 74, 86, 88, 90, 91, 107
Move Around, 58, 69, 86, 88, 91, 107
Multilevel List, 82, 87
Multiplication, 88, 100, 107
Netbanking, 140
Network Device, 127
Network Interface Controller, 113
New, 29, 42, 48, 56, 59, 63, 83, 87, 130
New Folder, 29, 42
New Page, 59, 83, 84, 87
Next Page, 67, 86
NTFS, 130
Num Lock, 41, 43
Number Pad, 39, 42
Octal, 122
OEM, 127
Off, 40, 42, 60, 64, 85, 110
Office Button, 64, 85
Offline, 67, 86
On, 40, 42
Online, 67, 86, 115, 117
Open, 48, 50, 52, 56, 57, 63, 110
Open with, 52, 57
Operating system, 8, 21
Output, 7, 21, 124
Output Device, 7, 21, 124
Overtype Mode, 74, 86
Overtype Text, 58, 74, 86
Page Break, 105, 107
Page Down, 41, 43
Page Layout, 59, 83, 87, 88, 102, 104, 105, 107
Page Number, 66, 84, 86
Page Orientation, 83, 87, 105, 107
Page Size, 59, 83, 87, 105, 107
Page Up, 41, 43
Paint, 45, 46, 56, 63

Paragraph, 68, 81, 82, 86, 87
Password, 114, 116, 134
Paste, 34, 42, 58, 74, 75
PATA, 129
Patch, 143
Path, 27, 42
Pathname, 28, 42
Pause Break, 41, 43
PCI Slot, 127
Peers, 117
Pen Drive, 8, 21, 130
Personal Computer, 6
Picture, 26, 27, 28, 49, 84, 87
Pirated, 142
Pivot Table, 106, 108
Plug and Play, 130
Portrait, 83, 87
Power, 7, 21, 126, 127
Power button, 7, 21
Powerpoint, 60, 85
Presentation, 62, 85
Presentation File, 62, 85
Previous Page, 67, 86
Primary Active, 25, 130
Primary DNS, 119
Print, 48, 56, 63, 67, 77, 84, 86, 87, 104, 105, 107
Print Layout, 67, 86
Print Preview, 84, 87, 104, 107
Print Titles, 105, 107
Printer, 7, 21, 84, 87
Processes, 135
Processor, 123, 126, 127, 129
Processor Fan, 127
Product Key, 142
Program, 8, 13, 21, 61, 85, 91, 107, 110, 133, 142
Program Cursor, 91, 107
Program Installation, 133
Program Menu, 61, 85
Program Version, 8, 21
Program Window, 13, 21
Projector, 62, 85
Proofing, 77, 86
Property, 38, 42, 105, 106
Prt Scr Sys Rq, 41, 43
PS/2, 130
Query, 62, 85
Quick Access Toolbar, 47, 56, 64
QWERTY, 39, 42
RAM, 125, 126, 127, 129, 132, 141
RAM cards, 127
Read only, 38, 42
Recycle Bin, 32, 42
Redo, 47, 56, 58, 73, 86, 96
References, 84, 87
Relationships, 62, 85
Removable Storage Device, 8, 21, 25
Rename, 31, 42, 90
Repeat, 58, 73, 86, 93
Replace, 58, 75, 76, 86
Reports, 62, 85
Restart, 18, 22, 126
Restart Button, 126
Restore, 13, 22, 138
Review Menu, 77, 86
Ribbon, 47, 53, 56, 57, 64, 85
Ribbon Bar, 64, 85
Ribbon Group, 53, 57, 64

Right Align, 80, 86
Right click, 10, 21
Right Indent, 65, 85
Right Tab, 66, 85
ROM, 125, 126
Router, 113
Row Height, 88, 104, 107
Rows to repeat, 105, 107
Ruler, 47, 56
Safe Mode, 18, 22
SATA, 127, 129
SATA Cables, 127
Save, 17, 22, 47, 48, 49, 50, 56, 63, 85
Save As, 48, 49, 56, 63
Save Icon, 63, 85
Scan, 137
Screen, 6, 20, 21, 22
Screen Saver, 20, 22
Scroll Button, 70, 86
Scroll Lock, 41, 43
SD Card, 109
SDRAM, 129, 132
Search Engine, 115
Search program or files, 42
Secondary DNS, 119
Section Break, 59, 83, 87
Sector, 136
Select, 10, 21, 55, 57, 72
Select Menu, 55, 57
Selection, 58, 71, 72, 86, 88, 94, 107
Send to, 36, 42
Server, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 139
Server Cache, 120
Server Farm, 119
Service Pack, 143
Set language, 77, 86
Shading, 59, 80, 87
Shapes, 54, 57, 64, 84, 85
Sheet Area, 90, 107
Sheet name, 90, 107
Shift, 36, 39, 40, 42, 70, 72, 94, 95, 99
Shortcut Icon, 35, 42
Show or hide, 54, 57
Show/Hide, 37, 42, 59, 81, 82, 87
Shut down, 12, 21
SIM, 114
Size Menu, 54, 55, 57
Slave Mode, 137
Sleep, 20, 22
Slide, 62, 85
Slide Area, 62, 85
Slide show, 62, 85
Slot, 127
Small Letter, 40, 42
Smart Phone, 111
SMPS, 126, 127
Software, 8, 21, 110, 111, 130, 133, 134
Sort, 59, 82, 87, 106, 108
Sound Device, 126
Space After, 80, 87
Space Bar, 40, 43
Space Before, 59, 80, 86
Speaker, 126
Spectrum, 112
Spell Check, 58, 66, 77, 86
Split, 67, 86
SSD, 127, 129

Stand Alone, 139
Start Menu, 11, 21
Start up Status, 143
Stationery, 84, 87
Statistical Analysis, 106, 108
Status Bar, 66, 74, 86
Storage Device, 7, 21, 123, 126
Strike through, 79, 86
Subfolder, 26, 42
Subscript, 79, 86
Subtotal, 106, 108
Subtraction, 88, 100, 107
Superscript, 79, 86
Surge Protector, 131
System and Security, 135
System Crash, 134
System Format, 136
System Imaging, 137
System Recovery, 137
System Registry, 134, 143
System Repair Disk, 132, 135, 138
System Restore, 134, 135
System Sound, 132
System Tray, 9, 21
Tab Key, 18, 22
Tab Set, 69, 86
Tables, 62, 64, 69, 84, 85, 104, 107
Task Bar, 9, 21
Task Manager, 135
Telecommunication, 112
Temp File, 134
Template, 84, 87
Terminal, 139
Text Box, 64, 84, 85, 87
Text Highlight, 58, 79, 86
Title Bar, 46, 56, 64
Toggle, 40, 42, 74
Tools, 54, 57, 134
Torrent, 117
Track, 136
Track 0, 136
Turn off, 20, 22
Underline, 78, 86
Undo, 47, 56, 58, 73, 86, 96
Unicode, 122
Uninstall, 134, 135
Unmerge, 103, 107
Untitled, 48, 50, 56
Unused Space, 135
Upload, 113
URL, 115, 116, 119, 120
USB, 8, 21, 25, 126, 127, 129, 130, 132
USB Extension Hub, 132
User Account, 134, 139
Utility Software, 111
Vertical Scroll Bar, 15, 22
VGA Monitor, 127
View Ruler, 67, 86
View Size, 48, 56
View Tab, 47, 53, 56, 57
Web Browser, 113, 115
Web Hosting, 118
Webpage, 115
Website, 115
Wifi Device, 127
Wifi dongle, 130
Windows Explorer, 12, 21, 32
Windows Menu Key, 40, 43
Windows Photo Viewer, 52, 57

Wireless Fidelity, 113
Word, 60, 63, 64, 85, 89, 110
Word Art, 64, 85
Word Options, 63, 85
Work Area, 48, 56
Workbook, 62, 85, 89, 107
Workbook File, 62, 85
Worksheet Area, 62, 85
World Wide Web, 112
Wrap, 103, 107
Zoom, 54, 57, 67, 86
Σ, 98, 100, 107